জাস্ট অ্যানাদার সাকার

জেমস হেডলি চেজ

সূচিপত্র

১. বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটা....................2

২. সদর দরজায় খানসামা....................54

৩. নিজের ঘরে ফিরে....................85

১. বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটা

জুলাই মাস। সকাল থেকেই বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটা পড়ছে। কয়েদখানার ঘড়িতে ঢং ঢং করে আটটা বাজল। লোহার ফটক পার হয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালাম।

বাইরে এসে মুক্তির আনন্দে সব সুন্দর দেখলাম যেন। কয়েদীদের বাড়িতে দিয়ে আসার জন্য সরকারি বাসটা এক কোণে দাঁড়ানো। কিন্তু আমি এই মুহূর্তে যাবো না বাড়িতে। সাড়ে তিন বছর পর স্বাধীনতার আনন্দে আমি দিশাহারা, উন্মত্ত।

এমন সময় পাশ থেকে একজন ডাকলো আমাকে, হ্যারি। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি ওদিকের বুইকে রেনিক আমাকে হেসে ভিতরে ডাকল। আমি দ্বিধাবোধ করেও গাড়িতে উঠলাম।

রেনিক তার হাত দিয়ে আমার ডান হাত চেপে ধরলো। মৃদু স্বরে আস্তে করে বলল এখন কিরকম লাগছে?

ভাল–কিন্তু তুমি এখানে! পুলিশের বড়কর্তা কি পাঠিয়েছেন?

মাথা নেড়ে রেনিক বলল, না সরকারী কাজে না, নিজের গরজেই এলাম।

যাক, গাড়িটা তো একদম নতুনকার গাড়ি? তোমার?

হ্যাঁ, মাস দুয়েক হলো কিনেছি।

তাহলে রোজগার ভালই হচ্ছে তোমার?

রেনিক শ্লেষের সাথে বলল বছর দুই হল বড়কর্তার স্পেশাল অফিসার হয়েছি।

আমি লজ্জা পেয়ে ছি ছি বললাম। গিয়ার পালটালো এবং অ্যাকসিলারেটরে চাপ দিয়ে বলল রেনিক–পুলিশ বিভাগে এখন অনেক রদবদল হয়েছে। নতুন বড়কর্তা মিডোজ খুব ভালো লোক।...তা এখন কি ঠিক করলে?

কিছুতো করতেই হবে, কাগজের অফিসের চাকরিটাও নেই।

হু, প্রথম প্রথম অসুবিধা তোমার হবেই।

আর উপায় কি? পুলিশ খুনের শাস্তি সোজা কথা না।

হ্যাঁ, সংবাদপত্র জগতে কিউবিট একজন কেউকেটা লোক তার নেকনজরে যখন পড়েছ, শত। চেষ্টাতেও কাগজে চাকরি আর হবে না তোমার।

হ্যারি বিরক্ত হয়ে বলল, সে যা করার করব। স্ত্রী লিনার প্রতিও কর্তব্য আছে। খানিক সময় চুপচাপ চলল। রাস্তায় মানুষ কম।

স্পীড বাড়িয়ে রেনিক বলল, হ্যারি পুলিশে চাকরি করলেও বিশ বছরের বন্ধুত্বে চির খাবে না। নতুন বড়কর্তাকে তোমার কথা বলেছি। তিনি দেখবেন বলেছেন।

আমি অবাক হয়ে বললাম, পুলিশে চাকরি? মরে গেলেও করব না।

তোমার বৌ নিনার কথা ভাব?

কষ্ট তো আমারও হয়েছে।

রেনিক বলল–বেশ তোমার চাকরি খোঁজা যদি সাহায্য মনে কর, তাহলে কিছু বলবো না।

দেখ, এই সাড়ে তিন বছর আমিও কম কষ্ট করিনি। অন্যায় ন্যায় এসব নিয়ে মাথা ঘামাই না। ওঃ, সাড়ে তিন বছরে। কিভাবে কেটেছে... নিনার ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দাও।

রেনিক বলল-ফুলের মতো নিষ্পাপ একটা মেয়ে–একখানা চিঠিও লিখলে না। তিন বছর, এক দিনের জন্যও জেলে দেখা করতে গিয়েও তোমার দেখা পেলো না। অথচ এমন দেখালে তুমি, যেন সে একটা বাইরের মেয়ে।

হ্যাঁ বাইরের মেয়ে...তুমি ভাবতে পারোনিনাকে লিখবো আমি চিঠি, তা পড়বে ওয়ার্ডার। তুমি ভাবতে পারো-সেই বালিকা ধর্ষণকারী শয়তানটা নিনাকে দেখে বাজে ইঙ্গিত করবে।

তবুও এরই মধ্যে প্রতিটি স্ত্রী স্বামীর সঙ্গ পেয়ে শান্তি পায়। এসব প্রতিকূলতা সব সমাজেই আছে।

আমি চুপচাপ থাকলাম। ডানদিকে সমুদ্র, শহর দূরে, বালিয়াড়ির এপাশে সারবন্দী অনেক কেবিন। বেশ খালি পড়ে আছে। দলবল নিয়ে আসে স্নানার্থীরা। এই কেবিনগুলো ছিল আমার প্রধান কর্মক্ষেত্র। ক্যালিফোর্নিয়ার সবচেয়ে নামী কাগজ হেরাল্ড, আমি তার সাংবাদিক। সারা শহর জুড়ে খবর খুঁজে বেড়াতে হয়। বিয়ে করেছি ধুমধাম করে। গাড়ি, বাড়ি দুই-ই করেছি। হঠাৎ সেই বিভীষিকার রাত।

বীচ হোটেলের পানশালায় বসে আছিহুইস্কির গেলাস নিয়ে। হাতের সিগারেট পুড়ে চলেছে। খবর চাই আমার। পাশের টেবিলে বসে আছে অচেনা দুজন ব্যক্তি। সমানে পান করে চলেছে। তারা দুজনে কি আলোচনা করছে।

যেই কথাগুলো কানে গেল অমনি মনে হল এ তো খবরের মত খবর।শিকাগোর এক কুখ্যাত গুণ্ডাবাহিনী এই শহর দখল করার তালে আছে। জুয়ার আড্ডা থেকে শুরু করে তারা কিছুই বাদ রাখবে না। এই শহর থেকেই তারা মাসকাবারে আয় করবে পঁচিশ লক্ষ ডলার।

লোকগুলো পাগল নয় তো। পাম সিটির মত শহর দখল করা চাট্টিখানি কথা নয়। কিন্তু না, কথা শুনে বুঝলাম তারা পুলিশ বিভাগ, স্বায়ত্ত শাসন বিভাগের বড় বড় কর্মকর্তাদের হাত করেছে। এত বড় কাণ্ড হতে চলেছে বসে থাকলাম না। নিজের চেষ্টায় তদন্ত চালালাম। কষ্ট হলেও কিছু কিছু প্রমাণ পেলাম। ছাপানোর আগে হেরাল্ডের মালিক মিঃ ম্যাথু কিউবিটের সাথে আলোচনা করলাম।

কিন্তু ম্যাথু নিষ্প্রভ, কোন ভাবান্তর দেখা দিল না তার মুখে। স্বয়ং তিনিই যে সেই দলে আছেন, তা যদি একটু টের পেতাম।

উনি বললেন কাগজপত্র সব এনে দেখাও। ছুটলাম বাড়িতে, রাস্তায় পুলিশ আমাকে পথরোধ করলো। পুলিশের বড়সাহেব আমাকে দেখা করতে বলেছেন। থানায় গেলে পর তিনি আমাকে মস্ত এক নোটের তাড়া দিয়ে বললেন টাকার বিনিময়ে আমার তদন্ত সংক্রান্ত কাগজপত্র তিনি কিনতে চান।

ঘুষ! না, টাকার বান্ডিল না নিয়ে উঠে পড়লাম। বাড়ি থেকে কাগজপত্র এনে দিলাম ম্যাথুর হাতে। তিনি বললে, রাত সাড়ে দশটায় আমি যেন তার বাড়িতে যাই। শুনে নিনাও ভয় পেল। দশটার একটু আগে নিনাকে নিয়ে বেরোলাম। রাস্তা ফাঁকা, মিনিট পনেরো আর বাকি, এমন সময় তীরবেগে একটা পুলিশের গাড়ি আমার গাড়িতে মারল ধাক্কা। ভাগ্য ভাল, কিছু হলনা। সজোরে ব্রেক কষলাম।

পুলিশের গাড়ি ততক্ষণে দাঁড়িয়ে পড়েছে। গাড়ির ড্রাইভার আহত। সঙ্গী লোকটি আমার হাতে চটপট এসে হাতকড়া পরালো। অপরাধ অসতর্কভাবে গাড়ি চালানো।

ঘটনার আকস্মিকতায় আমি যোবা; এমন সময় আর একটি জীপ এল। নামলেন সার্জেন্ট বেইলিস। তিনি যেন আগে থেকেই জানতেন সব। আমাকে নিয়ে তিনি গাড়িতে তুলে থানার দিকে চললেন। মাঝপথে গাড়ি থামিয়ে সার্জেন্ট আমাকে নামতে বললেন। গাড়ির ড্রাইভার শক্ত হাতে পিছমোড়া করে ধরলো আমার হাত। পকেট থেকে হুইস্কির

বোতলের পানীয়টুকু আমার শরীরে ছিটিয়ে দিলেন। বন্দুকের বাঁট দিয়ে আমার মাথায় মারলেন।

জ্ঞান ফিরলো জেলে। শুনলাম সেই ড্রাইভার নাকি মারা গেছে। এই অপরাধে সাড়ে তিন বছর জেল হল। উকিল প্রাণপণ লড়াই করেছে আমার জন্য, পারেনি। ম্যাথুআমার বিরুদ্ধে রায় দিয়েছেন। আমার নামে কুৎসা রটাতেও তার দ্বিধা হলনা। আমার উকিলের চাপে পড়ে আদালত তদন্তকমিশন বসালেন। তদন্তে আমার আবিষ্কার খাঁটি এবং নির্ভুল বলে প্রমাণিত হল। পুলিশের বড়কর্তা পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন।

আজ আমি মুক্ত। যদিও চাকরি পাবার সামান্য আশাও আমার নেই। যা আয় করেছি, দুহাতে উড়িয়েছি। নিনার জন্য কিছুই করতে পারিনি। ও কেমন আছে কে জানে। রেনিককে জিজ্ঞাসা করলাম ও ভালো তো!

হ্যাঁ, তোমার জেলে যাবার পর ও কাজে নেমেছে।

গাড়ি থামলো বাড়ির সামনে। নামলাম সেই পরিচিত ঘাস কাকরে ছাওয়া পথ। ছবির মতো সুন্দর বাংলো। ধীরে ধীরে পা বাড়ালাম বাড়ির দিকে। সদর দরজা খুলে নিনা জলভরা চোখে দাঁড়িয়ে রইল।

ঘুম ভেঙে দেখি ভোর হয়ে আসছে।নিনা নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে আমার পাশে। কি করবো, কোথায় যাবো। নিনাকে পাশে রেখে সিলিং-এর দিকে তাকালাম। রোজগার করতেই হবে যে করে হোক। ম্যাথুর মিথ্যা রিপোর্টের জন্য ছোট খাট সংবাদপত্রগুলো আমাকে দেখলে শিউরে ওঠে। আমাকে অন্য পথ দেখতে হবে।

নিনার দিকে তাকালাম। জেলে যাবার সময় নিনার বয়স মাত্র বাইশ, আমার সাতাশ।

আহা, বেচারী কি কষ্টই না করেছে। মুখে মলিনতার ছাপ। রোগাও হয়েছে। নিরুপায় হয়ে তাকে কাজ করতে হয়েছে। শত অসুবিধা সত্ত্বেও নিনা ব্যাঙ্কের আড়াইশ ডলার তোলেনি। সাত আট দিন নানা কথা ভাবতে ভাবতে দিন গেল।

গতকাল বিজ্ঞাপন দেখে এক অফিসে গেলাম। অফিসের বড়কর্তা আমাকে দেখে অবাক– আমি যে সুপরিচিত তা বুঝলাম। তিনি বললেন, এ কাজ আপনার জন্য নয়।

নিনার ডাকে চেতনা ফিরল। বললাম, না কিছু না।

আমার কাছে গোপন কোরো না। সাত পাঁচ ভেবে কোনো লাভ নেই। দেখো আমি ঠিক। চালিয়ে নিতে পারব। আমি তুমি কি আলাদা। তোমার যতটা দায়িত্ব আমারও তোততটাই।বলতে বলতে নিনার গলা ধরে এল।

দুহাতে কাছে টেনে নিলাম।-জেলে থেকে আমি আর আমি নেই। নিনা।

সারা শহরে কাজ নেই আমার জন্য তবুও পথে পথে ঘোরা। মদ খেয়ে সবকিছু ভুলে থাকি। আগেও খেতাম, এখন পরিমাণ বেড়েছে। হা মিথ্যা কথাও বলা শুরু করলাম নিনার কাছে। নিনার চোখে আমার অপদার্থতা প্রমাণ না করার ওটা একটা কৌশল মাত্র। কিন্তু আস্তে আস্তে নিনা ধরতে পারতো ঠিক। তবু কখনো কিছু বলতো না। আমার প্রতিটি কথা শুনতো, সমবেদনা জানাতো। আগ বাড়িয়ে পকেট খরচা দিত।

ভীষণ ভুল করত নিনা।

একদিন সমুদ্রের ছোঁয়া বাঁচিয়ে এক পানশালায় বসেছি। প্রায় সন্ধে তখন। তাকিয়ে আছি সামনের ফোন-খুপরির দিকে। নানা কথা ভাবছি, কখনো আত্মহত্যার কথাও–এমন সময় দরজা ঠেলে একটি মেয়ে ঢুকল।

পরণে সাদা স্ল্যাক্স, ওপরে সবুজ রঙের টাইট সসায়েটার। চোখে রোদ চশমা। শরীরে ঢেউ তুলে ফোনের দিকে গেল। বয়েস বছর তেত্রিশ তো হবেই। মাথা ঘুরিয়ে দেরার মত চেহারা। কিছুক্ষণ বাদে ফোন রেখে যে পথে এসেছিল সেই পথেই চলে গেল। কে এই মেয়েটা? হাতের হাতব্যাগটার কথা চিন্তা করলাম। ব্যাগটি নামিয়ে রেখে সে ফোন করছিল। কিন্তু বেরোবার সময় তো ব্যাগটা দেখিনি।

আমি উঠে দাঁড়ালাম। সমস্ত শরীরে শিহরণ খেলে গেলো। দরজা ঠেলে ঢুকে থমকে গেলাম। ব্যাগটা হাতে নিয়ে দেখি কি তার পরিচয়! দেখাই যাক, কি আছে ব্যাগে। চারিদিক একবার দেখে নিলাম।

সোনার সিগারেট কেস, সোনার লাইটার। একতাড়া নোটের বান্ডিল, ঘেমে গেলাম। কি করা উচিত।

উঃ, এতগুলো টাকা। আর নিনার কাছে হাত পাততে হবে না। সাতরকম ভাবনা এল। কত লোক আসছে, যাচ্ছে। আমিই যে নিয়েছি এমন কোনো প্রমাণ নেই। নিলাম, টাকাটা পকেটে পুরতে যাব, চোখ পড়ল সামনের ছোট আয়নার দিকে।

ঠিক আমার পেছনে মেয়েটি দাঁড়ানো। তাকিয়ে আছে আমার দিকে।

বলাবাহুল্য আমি অবাক। যেন মুহূর্তের জন্য মৃত্যু এসে আমার শিয়রে দাঁড়িয়েছে।

দরজায় মৃদু টোকা পড়ল। আলগোছে ব্যাগটা ফেলে দিলাম। একটানে দরজা খুললাম। চোখাচোখি হতে সে মৃদু হেসে বলল। আমার ব্যাগটা বোধহয় এখানেই ফেলে গেছি।

হ্যাঁ, ভাবছিলাম বেয়ারার জিম্মায় জমা দিয়ে যাব।

মাত্র দু পা এগিয়েছি, অমনি বেয়ারা এসে আটকালো।

আমাকে বলল, কি ইয়ার, গোলমালের ধান্দায় ছিলে নাকি?

সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি এগিয়ে এসে বলল, ছি ছি, গোলমাল কেন করবেন, উনি তোমার কাছে জমা দিতে যাচ্ছিলেন। আমি আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে আছি।

তবু ব্যাগটা একবার দেখে নিন। মেয়েটি বেয়ারার অনুরোধে অনিচ্ছায় ব্যাগটা পরীক্ষা করতে লাগলো। বুকের মধ্যে আমার হাতুড়ি পেটা শুরু হয়েছে। ভাবছি বেয়ারাকে ধাক্কা মেরে ছুটে চলে যাই।

তখনি সে মাথা নেড়ে বলল, না, সব ঠিক আছে। আমাকে বলল ধন্যবাদ আপনি না থাকলে ব্যাগটা আমার খোয়া যেতো। বেয়ারা সরে গেল। আমার বিস্মিত চাউনি দেখে মেয়েটি হেসে বলল, যদি কিছু মনে না করেন। একটু ড্রিঙ্কস দিতে বলি। প্লিজ, আপত্তি করবেন না মিঃ হ্যারি।

বাঃ মেয়েটি দেখি আমার নামও জানে। আসলে জেল থেকে ছাড়া পাবার পরদিন হেরাল্ড কাগজে আমার একটা ছবি ওরা ছাপিয়েছে। যাবতীয় তথ্য দিয়ে ঘটনা বিকৃত করে কিউবিট ছাপিয়েছে।

দুজনে চেয়ার টেনে বসলাম।ব্যাগ খুলে সোনার সিগারেট কেসটি বের করে বলল, সিগারেট?

একটা তুলে নিলাম, সোনার লাইটার টিপে ধরিয়ে দিলো, নিজেও একটা ধরালো।

তারপর জেল থেকে বেরিয়ে কেমন লাগছে?

ভালো।

খবরের কাগজের কাজটা ছাড়তেই হলো?

হ্যাঁ।

কদিন ধরে রোজই এখানে আসতে দেখি আপনাকে। চাকরি বাকরি কিছু তো হয়নি, তাই না? আসলে চাকরির বাজার খুবই খারাপ এখন।

যা বলেছেন।

আচ্ছা, কেউ যদি আপনাকে কাজ দেয়, করবেন?

অবাক হয়ে বললাম, তার মানে কোন চাকরি আপনার খোঁজে আছে।

আছে, আপনি কি সে কাজ করতে পারবেন?

কি কাজ?

তেমন কিছু না সাধারণ। সামান্য ঝুঁকি আছে।

কাজটা একটু বে-আইনী মনে হচ্ছে?

না, না, বে-আইনী না।

তবে ঝুঁকির প্রশ্ন আসছে কেন। না, না আমি আর এসব ঝামেলায় জড়াবো না।

সে হাসলো-খান। এবার সোজাসুজি তাকে বললাম, বলুন তো কাজটা কি?

বলব, সব বলব। নিরিবিলিতে। আপনার বাড়িতে ফোন আছে নিশ্চয়?

আছে, গাইড নম্বরে পাবেন।

বেশ কাল বাড়ি আছেন তো।

আছি। আজ উঠি, কত হলো বেয়ারা।

হেসে বললো ভুলে গিয়েছিলাম।

আমি বললাম, আমি ভুলিনি, হাসতে হাসতে পকেট থেকে টাকার বান্ডিলটা বের করে দিলাম।

ধন্যবাদ বলে সেশরীরে ঢেউ তুলে হাত নেড়ে দরজার দিকে এগোল। গাড়িতে উঠল। আবছা আলোয় গাড়ির নাম্বারটি নজরে পড়লো।

রাস্তা পার হয়ে বাঁদিকে অটোমোবাইলে একটা ছোট্ট অফিস। এ মার্শাল প্রধান কর্মকর্তা। সাংবাদিক জীবনে বহুবার তার কাছে আসতে হয়েছে।

এড বই পড়ছিল, আমাকে দেখে বলল আরে, হ্যারি। কি খবর? কেমন আছ?

ভালোই, আটদিন হল জেল থেকে ছাড়া পেলাম।

সিগারেট অফার করতেই এড় বলল–ছেড়ে দিয়েছি সিগারেট। ক্যান্সার রোগটা বড় চিন্তায় ফেলেছে।

ভালো।

নানা কথায় দশ মিনিট কাটলো।

এবার আসল কথা পাড়লাম। আচ্ছা এড়, খয়েরী রঙের একখানা রোলনম্বরটা SAX।গাড়িটা কার?

মি: ম্যানরুক্সের।

তাই নাকি?

গাড়ি বটে, পক্ষিরাজ।

ম্যানরুক্স, মানে সেই প্যারিসের ফেলিক্স ম্যানরুক্স?

হা। বছর দুয়েক হল এসেছে। বিরাট বাড়ি কিনেছে। উদ্দেশ্য স্বাস্থ্যোদ্ধার।

আমি হতভম্ব।

অর্থাৎ উনি হচ্ছেন সেই দস্তা আর তামার ব্যবসায় যিনি কোটিপতি।

হ্যাঁ বলেছি বছর খানেক হলো উনি কঠিন ব্যাধিতে পড়েছেন। ফুসফুসে ক্যান্সার।

চিন্তিত হয়ে বললাম- এত টাকা পয়সা ভোগ করে যেতে পারবেন না?

না, আর বাড়িও কি বাড়ি। সমুদ্রের পুব পাড়ে ইরা ক্র্যানলের বিরাট বাড়িটা। নিজের মনের মত করে সাজিয়েছেন।

ইরা ক্র্যানলে আমারও চেনা। তেলের ব্যবসা থেকে বিরাট ধনী হয়েছিলেন। প্রাসাদের মত বাড়িটা বানিয়েছিলেন। তারপরই কি একটা গোলমালে পড়ে বাড়ি বিক্রির কথা ওঠে।

আচ্ছা, ভালো কথা, ঐ মেয়েটি কে? নীল চশমা পরে গাড়ি চালাচ্ছিল?

ম্যানরুজের স্ত্রী।

সেকি! বয়েস তো বেশি না। বুড়োর বয়স তো সত্তর বাহাত্তর তো হবেই।

তাতে কি, টাকা থাকলে একশ বছরেও বউ জোটানো যায়। ইনি নতুন বউ। ফিল্মস্টার।

প্রথম বউ, তার খবর কি?

গাড়ির অ্যাকসিডেন্টে মারা গেছে।

তাহলে বুড়ো এসেছে স্বাস্থ্য ফেরাতে।

এসে উপায় কি? মেয়ে, বৌ বায়না ধরেছে এখানে থাকবে।

মেয়ে আছে নাকি?

হ্যাঁ, প্রথম পক্ষের সন্তান। আঠারো বছর বয়স। পরীর মত দেখতে। তা ওদের ব্যাপারে এত আগ্রহ, কি ব্যাপার?

কিছু না, গাড়ি, বউ দেখলাম। তাই জানতে এলাম, ব্যস।

ফেরার পথে সারাটা পথ ভাবতে ভাবতে এলাম। আগামীকাল সে ফোন করবে।

বীচ রোডে বাস থামলো। শিস দিতে দিতে বাড়ি ঢুকলাম।

পরদিন সকাল নটা নাগাদ হেরাল্ডের অফিসে গেলাম। রেফারেন্স রুমে গত দুবছরের কাগজের ফাইল নিয়ে বসলাম। খুব একটা খুঁজতে হলো না। এমন এক দুনিয়া তোলপারকারী খবর, প্রথম পাতাতেই স্থান পেয়েছে। রিয়া প্যারিসের এক শশা গার্ল। প্রৌঢ় ম্যানরুক্সকে বিয়ে করেছে তার অগাধ সম্পত্তির জন্য। নিনা বেরিয়ে গেছে কাজে। বাড়িতে ফিরে শুরু হল অপেক্ষা। ঠিক এগারোটার সময় ফোন এল। রিসিভার তুললাম-হ্যালো।

মি: হ্যারি? সেই তীক্ষ্ণ গলা।

হ্যাঁ, বলুন।

কাল আমাদের দেখা হয়েছিলো।

মনে আছে মিসেস ম্যানরুক্স

আমি তার নামটা জেনে যাব, সে আশা করেনি।

সমুদ্রের পুবদিকে একবার কেবিনের মধ্যে বাঁদিকের একটা কেবিন ভাড়া নিতে হবে আপনাকে। রাত নটায় দেখা করবো সেখানে।

বেশ ঠিক আছে।

তাহলে ঐ কথাটাই রইল বলে সে ফোন নামাল।

কি চায় মিসেস ম্যানরুক্স! বেরোলাম, পুব পাড়ের কেবিনের তত্ত্বাবধায়ক বিল হোল্ডনের কাছে গেলাম সাড়ে এগারোটায়। নারী পুরুষ সবাই স্নান করতে নেমেছে।

বিল আমাকে দেখে হেসে বলল, কতদিন পর দেখা হলো আপনার সঙ্গে, বসুন।

বাঁ দিকের শেষ কেবিনটা আজ রাত্রে আমার দরকার। নটা নাগাদ আসবো।

কিন্তু আটটার পর অফিস ভোলা রাখি না। সন্ধ্যের সময় চাবিটা যদি নিয়ে যান।

কি দরকার? আপনি বারান্দার কার্পেটের নীচে রেখে যাবেন। আমি খুঁজে নেব।

বিল ঠিক আছে, ঠিক আছে বলে বকবকানি শুরু করল। কথায় কথা বাড়ে। সময় নষ্ট করার সময় আমার নেই। আমি উঠে পড়লাম।

বাড়ি ফিরে নিনাকে কি বলবো? ভেবে ভেবে উপায় একটা বাতলালাম। রাত জেগে এড় মার্শালের সঙ্গে গাড়ি গুণতে হবে।

নিনা আমার কাজের কথা শুনে খুশীতে ডগমগ হয়ে উঠলো।

রাত সাড়ে আটটা নাগাদ–গ্যারেজে গিয়ে প্যাকার্ডখানা বের করলাম। হাত নেড়ে নিনাকে শুভরাত্রি জানিয়ে গাড়ি স্টার্ট দিলাম।

প্রায় নটা নাগাদ পৌঁছলাম। খাঁ খাঁ করছে চারিদিক। কার্পেটের নীচে ঘরের চাবি পাওয়া গেল।

বেশ বড়ই কেবিন। ঢুকে একটা বৈঠকখানা, একপাশে শোবার ঘর, ছোট্ট একটি স্নানঘর, ওপাশে রান্নাঘর। ঘরে কিছুরই অভাব নেই। বিলাসিতার ছড়াছড়ি।

বাইরের বারান্দায় বেতের একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলাম। প্রশস্ত সমুদ্রের ঢেউ এসে আঁচড় কাটছে বালির বুকে। দেখতে দেখতে পঁচিশ মিনিট কেটে গেল।

গুড ইভনিং মি:। অন্ধকারে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না। মাথায় সাদা সিল্কের স্কার্ফ, পরণেনীল পোশাক, ডান হাতে চওড়া সোনার ব্রেসলেট।

মুখোমুখি বসে সে হাসলো–আপনার সম্বন্ধে আমি অনেক কিছুই জানি, মিঃ। দশ হাজার ডলার যে অবলীলাক্রমে পায়ে ঠেলতে পারে, সে তেজী লোক। আমার একজন তেজী লোকেরই দরকার। আপনি তো ঝুঁকি নিতে ওস্তাদ।

আমি, ওস্তাদ কি করে?

আমার ব্যাগটা থেকে টাকার তোড়াটা সরালেন। ধরা পড়লে ছ বছরের জেল!

আমি তখন প্রকৃতিস্থ ছিলাম না।

ঝুঁকি নিতে রাজি আছেন আর একবার?

টাকাকড়ি তেমন পেলে আপত্তি নেই।

বেশ আপনাকে পঞ্চাশ হাজার ডলার দেবো।

আমার কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। কাজটা কি?

আগে বলুন, ঝুঁকি নিতে রাজি আছেন কি?

হা রাজি। টাকা পেলে নিনাকে নিয়ে এ শহর ছাড়বো। নতুন করে জীবন শুরু করব।

রুমালে মুখ মুছে সে বলল স্বামীর দেওয়া মাসিক ভাতা ছাড়া নিজস্ব বলতে আমার কিছু নেই। তিনি যা দেন তা যথেষ্ট। কিন্তু তার মেয়ে বা আমার ঐ টাকায় চলে না।

তা আপনার টাকা নেই, আমাকে কি করে পঞ্চাশ হাজার দেবেন?

আপনার টাকা আপনিই জোটাবেন। আমি শুধু আপনাকে পথটা বলে দেবো।

পথ?

হা, পথ। শুনুন, আমি এবং আমার সৎ মেয়ে ওদেত, আমাদের দরকার সাড়ে চার লাখ ডলার। দু-সপ্তাহের মধ্যে টাকাটা চাই। আমার একান্ত আশা, এই টাকা যোগাড় করতে আপনি সাহায্য করবেন। বিনিময়ে আপনি পঞ্চাশ হাজার পাবেন।

আমাকে আপনার স্বামী টাকা দেবেনই বা কেন?

আমার স্বামীর অঢেল টাকা, চাইতে গেলে হাজারো কৈফিয়ত চাইবেন। ওদেত বা আমি, আমরা এসব প্রশ্নের জবাব দিতে রাজি নই। আপনার ক্ষেত্রে কৈফিয়ত লাগবে না।

আচ্ছা, আপনার হঠাৎ এত টাকার দরকার হল কেন?

বা, কোটিপতির বৌ-মেয়েদের টাকার দরকার নেই।...নাম ধাম সব তো জেনে বসে আছেন।

আপনারা কি কোনো ব্লাকমেলারের হাতে পড়েছেন?

মিঃ আমাদের ব্যক্তিগত ব্যাপারগুলোয় অযথা কৌতূহল দেখাবেন না। টাকা আমাদের চাই। আপনার সাহায্য পেলে আপনি পাবেন, ব্যস যথেষ্ট নয় কি।

না, কারণ, আপনার ক্ষমতা নেই টাকা দেবার।

এখন নেই পরে পাবেন। শুনুন, আমার সৎ মেয়ে ওদেত গুণ্ডাদের হাতেপড়বে, অপহৃতা হবে। গুণ্ডারা দাবি করবে পাঁচ লাখ ডলার। আপনার কমিশন নেবেন। বাদবাকি আমি আর ওদেত সমান ভাগে ভাগ করব।

গুণ্ডারা কারা?

কেউ না, আসলে ওদেত দূরে কোথাও যাবে। আপনি ভয় দেখিয়ে আমার স্বামীর কাছ থেকে টাকাটা আদায় করবেন। টেলিফোনে একদিন ধমকাবেন, টাকার দাবি করবেন। ব্যস, মিটে গেলো ঝামেলা।

আমি হতভম্ব। ধরা পড়লে হয় ফাঁসি,নয় গ্যাস চেম্বার। কাজটা সাংঘাতিক। একটা ভয় এসে পাকে পাকে জড়িয়ে ধরছে।

কি বলবো ভেবে পাচ্ছি না। সে হেসে বলল, কোনো উপায় নেই মিঃ এ ঝুঁকি নিতেই হবে টাকাটা পাবার জন্য।

কিন্তু এর পরিণাম বুঝছেন তো?

হ্যাঁ, কোন ভয় নেই। সেরকম হলে স্বামীকে আমি সব খুলে বলব। ব্যস তাহলে তো আর.. ঝামেলা রইল না।

অর্থাৎ সত্যি কথা শোনামাত্র আপনার স্বামী পুলিসকে বলবেন তার কাছ থেকে পাঁচ লাখ ডলার হাতানোর জন্য মেয়েকে নিয়ে তার স্ত্রী একটু মজা করছিলেন।

অবাক চোখে রিয়া তাকায়।

ভুলে যাবেন না আমি একজন সাংবাদিক ছিলাম। কোটিপতি। ম্যানরুলের মেয়ে গুণ্ডাদের হাতে পড়বে কম কথা না। খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপানোর মতো খবর বটে।

রিয়া নড়ে বসে বলল, সহজ ব্যাপারটাকে আপনি জটিল করে তুলছেন। ওদেত হঠাৎ একদিন উধাও হবে। আপনি ফোন করে বলবেন, তারপর উনি বিন্দুমাত্র দেরীনা করে টাকাটা দিয়ে দেবেন। এর মধ্যে গোলমালটা কোথায়?

আপাত দৃষ্টিতে কোথাও না, কিন্তু পরে।

পরে কি হবে না হবে, সে ভাবনা এখন না। আগে বলুন কাজটা করতে রাজি আছেন কিনা। না হলে আমি অন্য লোকের খোঁজ করবো।

হাসলাম আমি। সে যাই হোক, যা করবার আপনি করবেন। আমি শুধু এটাই বলছি কাজটা আমার পছন্দ সই না।

মিঃআপনাকে দিয়ে বোধ হয় কাজটা হবে না। দুঃখিত।

এখানেই শেষ করলে হত, কিন্তু পঞ্চাশ হাজার ডলারের লোভ কম না।

আপনি ভুল করছেন, কাজটা আমার পক্ষে সম্ভব নয়–একথা বলিনি একবারও। জেলের ঘানি টানতে কারই বা ভালো লাগে?

আপনি অযথা চিন্তা করছেন।

আচ্ছা, মি ম্যানরুক্স কি বিশ্বাস করবেন যে তার মেয়ে উধাও হয়েছেন।

মেয়ে বলতে তিনি অজ্ঞান। ব্যস্ত হয়ে উঠবেন তিনি।

টাকাটা আদায় করে আপনি টাকা নিয়ে বাকিটা আমার হাতে তুলে দেবেন।

মেয়েকে দেবো না? আকস্মিক প্রশ্নে সে ঘাবড়ে গেল। ঘাড় নাড়লো, হ্যাঁ।

বেশ, খুঁটিনাটি বিপদ ছাড়া চিন্তার কোন কারণ নেই। পুলিশকে খবর না দিয়ে আপনার স্বামী হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবেন এটা বিশ্বাস হয় না।

স্বামীকে সামলাবার দায়িত্ব আমার। তিনি বৃদ্ধ অসুস্থ, মৃত্যুপথযাত্রী।

ঠিক আছে, আগামীকাল আমার মতামত ফোন করে জেনে নেবেন।

কাল কেন? আজই বলে দিন না?

ভাবতে হবে আমাকে। আগামীকাল বলবো।

ব্যাগ খুলে নোটের একটা তাড়া ছুঁড়ে দিলো। কেবিনের ভাড়ার খরচ। কাল ফোন করবো। দশটা বেজে দশ মিনিট। নিনাকে বলে এসেছি রাত হবে ফিরতে।

আগাগোড়া ব্যাপারটা উলটে পালটে ভাবতে লাগলাম। সিগারেটের পর সিগারেট পুড়তে লাগলো। প্রায় বারোটা নাগাদ সিদ্ধান্তে পৌঁছলাম।

হা, করবো আমি। একাজ করবো। পরদিন সকাল আটটায় গেলাম বিলের কাছে। আরো একদিনের জন্য কেবিনটা চাই। ভাড়া দিলাম। ঠিক, এগারোটায় ফোন এল।

মিঃ?

হ্যাঁ।

কি রাজি আছেন তো?

হ্যাঁ, শুধু একটা শর্ত আপনাদের দুজনের সাথে একটু কথা বলতে চাই আবার।

ফোন রেখে গাড়ি স্টার্ট করে চলে গেলাম।

সন্ধ্যে ছটায় কেবিনে এলাম। সারা দিন ধরে বাড়িতে ছিলাম। টুকিটাকি জিনিষ নিলাম। টেপরেকর্ডার নিলাম। পুলিশের খপ্পরে পড়লে নিজেকে বাঁচাবার এটাই হবে মোক্ষম প্রমাণ।

দরজা খুলে শোবার ঘরে এলাম। টেপরেকর্ডার কায়দা করে ঠিক করলাম।

মাইক্রোফোনটা ফুলদানির পেছনে রাখলাম। ওরা আসার আগে সবটাই আবার পরীক্ষা করে নিলাম।

যাক নিশ্চিন্ত। এমন সময় দরজায় টোকা পড়ল। সাড়ে সাতটা বাজে। কে আসতে পারে? দরজা খুললাম। বিল হোল্ডেন দাঁড়িয়ে আছে।

এক ভদ্রলোক একটু আগে এই কেবিনটা ভাড়া নিতে চাইছিলেন। তা আপনি..

না বিল, কয়েকটা লেখা শুরু করেছি। দিন সাতেক লাগবে। এমন নিরিবিলি পরিবেশ না হলে মাথায় কিছু আসতে চায় না।

ঠিক আছে মিঃ। বেশ খিদে পেয়ে গেছে। কাছের কোনো রেস্তোরাঁ থেকে খেয়ে নিতে হবে। হাতে বেশি সময় নেই।

নটা বাজতে পাঁচ যখন তখন, কেবিনে এসে পৌঁছলাম। অসহ্য গরম। বেতের চেয়ারটা টেনে বারান্দায় বসলাম।সিগারেট ধরালাম। ভেতরে ভেতরে বেশ একটা চাপা উত্তেজনা অনুভব করছি। রিয়া কি আজও দেরিতে আসবে! আর ওদেত, কেমন মেয়ে কে জানে!

চিন্তায় ছেদ পড়লো। রিয়া এসেছে। সঙ্গে কেউ নেই। ঘরে ঢুকলাম।

কই আপনার মেয়ে কোথায়?

আসবে। এক টানে মাথার স্কার্ফ খুলে ফেললো সে। কি কিছু বলবেন?

বলবো মানে, মিস ম্যানব্রুক্সের সঙ্গে একটু আলোচনার দরকার।

আশ্চর্য, এত আলোচনার কি দরকার? ওদেত তো বাচ্চা নয়। তাকে না জানিয়ে কিছু করা হবে না।

বারান্দায় পায়ের শব্দ শোনা গেল। দরজা খুললাম।

দরজার ওপাশে যুবতী দাঁড়িয়ে। কালো কুচকুচে এক মাথা চুল কাধ ছাপিয়ে পিঠ অবধি নামানো, পানপাতার মতো মুখ। ষোলো থেকে ছাব্বিশের মধ্যে বয়েস। ওদেত সুন্দরীসন্দেহ নেই। কিন্তু সারা শরীরে ইন্দ্রিয়ের ভোগসুখ ছাড়া যে সে কিছু বোঝে না, তা বোঝা যাচ্ছে।

হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠলো ওদেত আপনি বুঝি আলিবাবা? আপনার চল্লিশ চোরের খবর কি?

রিয়া বকে উঠল, ওদেত এটা হাসি-তামাশার সময় নয়। জরুরী কথা আছে।

ওদেতের মুখোমুখি সোফায় বসলাম। হাসলো ওদেত। বলুন, কি বলতে চান। বলবেন আপনি, আমি শুনবো।

প্রথমে বলুন এই অপহরণের ব্যাপারটা আপনি জানেন কি না।

নিশ্চয়ই। আমি, রিয়া দুজনেই জানি।

রিয়াকে জিজ্ঞেস করলাম, কাজটা কবে নাগাদ করতে চান?

যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব।

মিস ম্যানরুক্স কোথায় উধাও হবেন?

কার্মেলে। তিন চারদিন ও সেই হোটেলেই থাকবে।

কিভাবে যাবে?

গাড়িতে! ওর নিজের গাড়ি আছে।

তাহলে এই অপহরণের ঘটনা আমরা ছাড়া কেউ জানবে না। তাই তো?

হ্যাঁ।

বেশ, আপনার কথা মতো না হয় নিশ্চিন্তেই রইলাম। ধরে নিলাম আপনার স্বামী টাকা। দিলেন। এখন মেয়েকে নিরাপদে ফিরে আসতে দেখেও কি তিনি ব্যাপারটা তদন্ত করার জন্য পুলিশ ডাকবেন না?

আমি আবারও বলছি মিঃ স্বামী সংক্রান্ত সব কিছু সামলাবার দায়িত্ব আমার। আপনার নয়।

ঠিক আছে। মিস ম্যানরুক্স, আগামী শনিবার আপনার এক বান্ধবীর সাথে আপনার সিনেমা দেখার আয়োজন করতে হবে।

ওদেত ঘাড় নাড়লো,-তারপর?

যাবার আগে দুপুরে খাবার টেবিলে বাবাকে কথাটা জানাবেন। বান্ধবীর সঙ্গে দেখা করার কথা থাকবে রাত নটার সময়। আপনি সিনেমা হলের ধারে কাছেও যাবেন না। বাড়ি থেকে সোজা বেরিয়ে গাড়ি নিয়ে চলে যাবেন পাইরেটস কেবিনে। বাইরে গাড়ি রেখে ঢুকে যাবেন কেবিনে। খাবারের অর্ডার দেবেন। সাবধান, পরিচিত কারুর সঙ্গে যেন দেখা না হয়।

হবে না।

আসলে পরিচিত লোকজন যাতে না দেখে ফেলে। অপরিচিতরা আপনাকে মনে রাখুক। মিনিট। পাঁচেকের বেশি থাকবেন না। সকলের চোখ এড়িয়ে উঠে বসবেন গাড়িতে। নতুন পোশাক, লাল পরচুলা থাকবে পেছনের সীটে। চটপট পরে নেবেন।

আমি ততক্ষণে আপনার গাড়ি নিয়ে এগোবো। কোনো নির্জন জায়গায় আপনার গাড়ি রেখে আমি উঠেবসবোআমার গাড়িতে। সোজাবিমানবন্দর। লসএঞ্জেলসের হোটেলেও আপনার নামে ঘর নেওয়া থাকবে। হোটেলের ম্যানেজারকে বলবেনআপনিঅসুস্থ। খাবারটাবার যেন সে আপনার ঘরেই পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করে। আমার ফোন না পাওয়া পর্যন্ত আপনি ঘর ছাড়বেন না।

রিয়া বলে উঠল–ওদেতকে তো লস এঞ্জেলসেনা পাঠিয়ে কার্নেলে পাঠালেই ভালো হতো।

টাকা পেতে হলে আপনাদের আমার কথামত কাজ করতে হবে। ওদেতকে প্লেনে তুলে দিয়ে আমি আর দেরী করব না। কাছাকাছি কোন বুথ থেকে মিঃ ম্যানরুক্সকে ফোন করব।

প্রথমে তার সেক্রেটারীর টেবিলে ফোন করবেন। তারপর স্বামীর সঙ্গে সে যোগাযোগ করবে, আমি সে সময় তার ঘরেই থাকবো। টেলিফোন যাতে তিনি ধরেন, সেই ব্যবস্থা করবো।

তার আগে ওদেতকে সেই বান্ধবীকে দিয়ে ইতিমধ্যে একবার ফোন করাতে হবে। এটা তোমারই দায়িত্ব ওদেত। তুমি তাকে বলে রাখবে তোমাকে সে যদি নটার মধ্যে হলের সামনে পৌঁছতে না দেখে, তাহলে যেন বাড়িতে ফোন করে খবর নেয়।

তারপর?

তারপর আর কি আমার ফোন পৌঁছবার আগেই তুমি উধাও।

ফোনে তাকে বলবো, রাত দুটো নাগাদ টাকা নিয়ে তিনি যেন ইস্ট বীচ রোড ধরে এগোতে থাকেন। টাকা থাকবে অ্যাটাচিতে। পথের পাশে এক জায়গায় তিনবার আলোর সঙ্কেত তিনি দেখতে পাবেন। সেখানে অ্যাটাচিটা ফেলে তিনি চলে যাবেন। ওদেত কেবিনে আমার জন্য অপেক্ষা করবে। আমি আমার অংশ নিয়ে বাকি টাকা তার হাতে তুলে দেবো।

রিয়া সজোরে বলে উঠল, না তা হবে না। টাকা আপনি আমার হাতে দেবেন।

ওদেত বলে উঠল, কেন আমাকে দিলে তোমার আপত্তি কোথায়?

তোমাকে আমি বিশ্বাস করি না।

ওদেত ঠোঁট ওল্টালো।–একবার তোমার হাতে টাকা পড়লে...।

আমি হাত তুলে থামালাম। দাঁড়াও, দাঁড়াও। সমাধান করে দিচ্ছি। তোমার বাবাকে দিয়ে তুমি একটা চিঠি লিখিয়ে রাখবে। টাকা দিয়ে যেন তিনি সোজা লোন বে-তে চলে যান। তোমার সঙ্গে তার সেখানেই দেখা হবে।

কিন্তু বাবা যদি সেখানে আমাকে না দেখতে পান তাহলে সোজা পুলিশে খবর দিতে পারেন।

মাথা নাড়লাম আমি। ঠিক। তবে তার জন্য আগে থেকেই প্রস্তুত থাকতে হবে। লোন বে তে তোমার গাড়ির পেছনের সীটে থাকবে আরেকটা চিঠি। তাতে লেখা থাকবে তিনি যেন সোজা বাড়ি ফিরে যান, সেখানে তোমার সঙ্গে দেখা হবে।

হ্যাঁ তা-ই ভালো আপনি দুজনের হাতে টাকা তুলে দেবেন।

এবার কাজের কথায় আসা যাক, অপহরণের দিন থেকে ঘটনা সব বাবা জানতে চাইবেন। তুমি আসার পর তিনি পুলিশেও যোগাযোগ করতে পারেন।

না পুলিশে উনি যোগাযোগ করবেন না। কারণ উনি ঘরের কেলেঙ্কারি বাইরে ছড়াক চাইবেন না। রিয়া বলল।

তবু পুলিশকে আমাদের হিসেবের মধ্যে রাখতেই হবে। ওদেত কাল তুমি আবার আসবে।

আমার কাছ থেকে সব তুমি শিখে নেবে।

রিয়া বলে উঠল অনর্থক আপনারা আবার সময় নষ্ট করবেন, মিঃ?

আমি বলে উঠলাম; আমাকে দিয়ে যদি কাজ করাতে চান, তবে আমার কথামতো আপনাদের চলতে হবে।

আমি কিন্তু কাল আসব। হাসতে হাসতে ওদেত চোখ টিপলো।

বেশ, উঠে দাঁড়ালাম। মিসেস ম্যানরুক্স, ইতিমধ্যে আপনাকে একটা জরুরী কাজ সারতে হবে।শহরতলীর কোনো অখ্যাত দোকানের শরণাপন্ন হবেন। ওর জন্য সাধারণ একপ্রস্ত পোশাক কিনে নেবেন।

ঠিক আছে। কালই কিনে ফেলবো।

কাল ওদেতের সঙ্গে সব পাঠিয়ে দেবেন।

রিয়া আর ওদেত চলে গেল।

দরজা বন্ধ করে আমি আর দাঁড়ালাম না, তাড়াতাড়ি বোতাম টিপে টেপ-রেকর্ডার বন্ধ করলাম।

পরদিন রাত নটার একটু পরেই ওদেত এলো। সাদামাটা ফ্রক, হাতে ছোট সুটকেশ।- বান্দা হাজির। আদেশ করুন।

এসো, ভেতরে এসো। মা কখন আসবে?

তুমি তো একলা আমাকেই আসতে বলেছ। বৈঠকখানার আলো জ্বলার সাথে সাথে টেপ রেকর্ডার চালু হল।

ওদেত সোফার পায়ের ওপর পা তুলে বসলো- রিয়া তোমাকে জব্বর পাকড়েছে।

আমি অবাক, পাকড়েছে মানে?

ঐ যে টেলিফোনে হাতব্যাগ ফেলে আসার ঘটনাটা। ওটা তো জানতই।

আমি তখন স্বাভাবিক ছিলাম না। যাই হোক রিয়ার ব্যাপারে সাবধান থেকে। তাহলে কাজটা হচ্ছে শনিবার, মভিসের সাথে সিনেমা যাচ্ছ।

তোমার বান্ধবী ছাড়া বন্ধু আছে।

ঝুরি ঝুরি, কেন?

একজনেরই নাম করো।

জেরা উইলিয়াম।

বেশ তা এর সাথে কি ফোনে কথা হয়? হয়। চমৎকার, কে ফোন ধরে?

আমাদের খানসামা।

এসব প্রশ্ন করার কারণটা বলি। শনিবার তুমি সিনেমা দেখতে যাবার কিছুক্ষণ পর পৌনে নটা নাগাদ আমি ফোন করবো।

বাপরে বাপ এযে দেখি অ্যাডভেঞ্চার।

হ্যাঁ, তবে খাঁটি না ভেজাল। কারণ পুলিশের ব্যাপারটা একদম ভুলতে পারছি না। রাস্তা পার হবার সময় তোমাকে কেউ মুখ চেপে ধরেছে, টেনে অন্য গাড়িতে তুলেছে। গাড়িতে একজনের হাতে ধরা তোমার মুখ, আরেকজন পিস্তল ঠেকিয়ে রেখেছে তোমার পাঁজরে। তোমাকে বাদ দিয়ে তোক সাকুল্যে তিনজন। শুনে মনে হবে তিনজনই ইটালির লোক। কি কি কথা হবে তার একটা খসড়া তৈরি করে রেখেছি। পড়ে মুখস্থ করে নাও। যথারীতি গাড়ি অনেকবার ঝাঁকি দেবে। তুমি অনুমানে বুঝবে বড় রাস্তা ছাড়িয়ে গাড়ি শহরের বাইরে যাচ্ছে। প্রায় দুঘন্টা চলার পর গাড়ি দাঁড়াবে। লোহার গেট খুলবে। কুকুর ডাকবে। নুড়ি পাথরের রাস্তা ধরে গাড়ি এগিয়ে যাবে। যেমন বললাম, মনে রেখো। এই বাড়িতে তুমি থাকবে মোট তিনদিন। তোমাকে একটা বন্ধ ঘরে রেখে দেব। বন্দী

থাকাকালীন তুমি কুকুর, গরুর ডাক শুনতে পাবে। কটা মুরগীও জুড়ে দিতে পার। সকাল থেকে রাত অবধি ওরা যা খেতে দিতে, তারও একটা তালিকা তৈরি করেছি। সব ব্যাপারটা নিখুঁত হবে।

তুমি এমনভাবে বলছ যেন সত্যি আমি গুণ্ডাদলের খপ্পরে পড়েছি।

হ্যাঁ, অভিনয় করতে হবে। এবার বাবাকে দুখানা চিঠি লিখে ফেলল। হ্যাঁ, যাবার আগে সঙ্গে আনা পোশাক এবং পরচুলাটা একবার পরে দেখিয়ে যাও তো।

মিনিট দশেক পরে নতুন পোশাকে ওদেত এল। পিঠের চেনটা লাগিয়ে দাও তো বলে পেছন ফিরলো।

আমি কাঁপা হাতে প্রাণপণে নিজেকে সংযত রেখে চেন টানলাম। নিমেষে ঘুরে সে আমার গলা জড়িয়ে ধরলো। আমি এক ঝটকায় তাকে সরিয়ে দিলাম। আমি বললাম- এগুলো কিন্তু অকাজ।

কাজের সঙ্গে ভালো থাকার কোন সম্পর্ক নেই।

ওদেত শোবার ঘরে গেল কাপড় পালটাতে। হ্যারি... চেনটা খুলতে পারিছ না ওদেত ডাকল, হ্যারি...

নাঃ, এ ডাককে অগ্রাহ্য করতে পারব না। কোনো পুরুষই পারবে না।

কেবিনের দরজা ভেতর থেকে লাগালাম। এগিয়ে গেলাম শোবার ঘরে।

গ্যারেজে গাড়ি রাখতে গিয়ে রেনিকের বুইকখানি দেখে অবাক হয়ে গেলাম। জেল থেকে ছাড়া পাবার পর এই এল। এত রাতে কিসের দরকার। নিনার কথা মনে হতে নিজেকে ছোট লাগল। নিনার মত স্ত্রী থাকতে ওদেতেরকামনায় নিজেকে সমর্পণ করা উচিত হয়নি। লজ্জায় মরে গেলাম।

ঢাকা বারান্দায় ওরা দুজনে বসে গল্প করছে।

দরজার পাশে দাঁড়িয়ে ডাকলাম, নিনা। নিনা ছুটে এসে আমার গলা জড়িয়ে ধরে চুমু খেল। আমি অমানুষ, অপদার্থ।

নিনার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছি। রেনিককে জিজ্ঞাসা করলাম, কি ব্যাপার?

এক মাস ছিলাম না, ওয়াশিংটন গিয়েছিলাম। আজই ফিরলাম। শুনলাম তুমি নাকি চাকরি পেয়েছে।

বলার মত কিছু না।

বড় কর্তার সঙ্গে কথা বলে আমি তোমার জন্য একটা ব্যবস্থা করতে পারি।

না বন্ধু, পুলিশের দয়া গত তিনবছর ধরে পেয়ে বুঝেছি, আর দয়া চাই না।

কিন্তু সে পুলিস আর নেই।

আমাকে একটু ভাবতে দাও।

নিনা বলে উঠল, ভাবনার কি থাকতে পারে হ্যারি?

না, একটু ভেবে দেখি।

বেশ? রেনিক বলল, ভেবেই খবর দিও।

চলি তাহলে, গুডনাইট বলে চলে গেল রেনিক।

নিনা আমার গলা জড়িয়ে বলল, চাকরিটা তুমি নাও, সব দিক থেকে চিন্তা করে দেখো।

নিনা আমার ঘুম পাচ্ছে। আর দাঁড়ালাম না, পোশাক পাল্টে বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম।

নিনা পোশাক পাল্টে বিছানায় আমার পাশে শুয়ে পড়লো। একটা হাত রাখলো আমার বুকে।

আমি নিনার পবিত্র হাত শরীর থেকে সরিয়ে দিলাম। আলগোছে পাশ ফিরলাম। পরদিন বৃহস্পতিবার নিনা গেল গাড়ি নিয়ে। সারাদিন কিছু করার নেই। ওদেতের কথা মনে হল। কালকের অপরাধ বোধটা আর নেই। ওদেতকে আমার চাই। আমি জানি আমি অনেক নীচে নেমে গেছি। রেনিকের দেওয়া সুখের চাকরি থেকে নোংরা পঙ্কিল জীবনের দিকে এগিয়ে গেলাম। পাপ আমাকে টানছে। সন্ধ্যের সময় কেবিনে গেলাম। সমুদ্রে স্নান করে, সাঁতার কেটে সময় যেন কাটছে না, কখন ওদেত আসবে।

পরদিন নিনা আবার কথাটা তুলল। আমি ভাবছি, বলে কফির কাপে চুমুক দিলাম।

নিনা পাওনাদারদের বিলগুলো তুলে ধরলো। আমি মুদীআর ইলেকট্রিকের টাকা দিয়ে দিলাম।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলাম। আবার কেবিনে গেলাম। ওদেতকে পাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলাম আগে কেন ওদেত আসে না। অবশেষে সে এলো। দৌড়ে জড়িয়ে ধরলাম। কিন্তু সে এক ঝটকায় আমাকে সরিয়ে দিলো।

মেয়ে দেখলেই অমন চুকচুক কেরো না।

রাগে দপকরে জ্বলে উঠলাম।ইচ্ছে হল গলা টিপে শেষ করে দিই। সিগারেটের ধোঁয়া উড়িয়ে ওদেত বলল, খুব তো প্রথম দিন তেজ দেখাচ্ছিলে? কোথায় গেল সেই তেজ। আসলে তোমরা এক একটা...।বল কি জরুরী কথা।আমিকাগজগুলো মেলে ধরলাম। প্রশ্নের পরপর জবাবদাও।

ওদেত হেসে বলল, পরীক্ষাটা কে দেবে হ্যারি, তুমি না, আমি?

চুপ করো...তোমার সস্তা মতামত শুনতে আসিনি।

একের পর এক উত্তর দিতে লাগল ওদেত নির্ভুলভাবে।

আমি চমৎকৃত। ঠিক আছে আগামী শনিবার কাজে নামছি।

ওদেত বুকের কাছে ঘন হয়ে দাঁড়ালো।

রাগ পড়লো?

মুহূর্তে আমার ডান হাত আছড়ে পড়লো ওর মসৃণ গালে।

ওদেত গালে হাত ঘষলো- তুমি, আমায় মারলে হ্যারি?

বেরিয়ে যাও, দূর হও।

ওদেত পায়ে পায়ে দরজার দিকে এগোললা, নিঃশব্দে বেরিয়ে গেলো ঘর ছেড়ে।

তবুও আমাকে হারিয়ে দিলো ওদেত। ঘুম ভাঙতে সকাল সাড়ে সাতটা হয়ে গেল। আজ শনিবার।

নিনাকে বললাম, আমার আজ ফিরতে দেরী হবে।

জনের সঙ্গে দেখা করবে না?

না, সোমবার যাবো।

চাকরিটা তুমি নেবে হ্যারি?

দেখি কেমন মাইনে-পত্তর দেয়?

উঠে নিনাকে জড়িয়ে ধরলাম। নিজেকে ভারি পবিত্র মনে হল।

বেলা দশটা নাগাদ কেবিনে গেলাম। কে যেন দরজায় কড়া নাড়লো।

খুলে দেখলাম বিল হোল্ডেন।

কেবিনটা কি সামনের সপ্তাহেও রাখবেন?

হ্যাঁ।

এ সপ্তাহের ভাড়া যদি আজ দিতেন।

কাল দেব, মানিব্যাগটিই আনতে ভুলে গেছি।

ঠিক আছে, মিঃ।

রিয়ার ফোন এল। আজই তাহলে কাজে নামছেন?

সেরকমই তো ইচ্ছে।

কাল বেলা এগারোটায় আমি আবার ফোন করবো।

টাকাকড়িও কিছু নিতে হবে। এখানে চলে আসুন।

আসবো।

বৃষ্টি পড়ছে। আটটা নাগাদ বৃষ্টি ধরল। পৌনে নটা নাগাদ ডায়াল ঘোরালাম। রিং হবার সঙ্গে সঙ্গে ওপাশের সাড়া মিললো

কাকে চাই?

ওদেত, বলুন জেরী উইলিয়াস ফোন করছে।

একটু ধরুন।

ওদেত রিসিভার তুলল।

বলো

আশে পাশে কেউ আছে নাকি?

না। কাল তুমি আমাকে মারলে কেন?

ওসব বাদ দাও। কি কি করতে হবে, মনে আছে তো!

আছে!

তাহলে বেরিয়ে পড়ো। ফোনটা রাখলাম। কেবিনে জমজমাট ভিড়। কিন্তু ওদেত এখন আসছে না কেন?

নটা বেজে পঁচিশ। হঠাৎ লোহার ফটক পেরিয়ে ঢুকলো ওদেতের দুধ সাদা রঙের ছোট্ট গাড়িখানি।

পরণে লাল পোশাক, মুখ গম্ভীর। আমি হাত নাড়লাম। সেও হাত নাড়ালো। আমি তার গাড়ির দিকে পা বাড়ালাম।

জানলার কাঁচ নামিয়ে রেখে গেছে ওদেত। সঙ্গে আনা সুটকেশটা পড়ে আছে সীটের ওপর। হাতে এখন অঢেল সময়। লস এঞ্জেলসের প্লেন ছাড়ল সাড়ে দশটায়। ওদেতের নামটা পাল্টানো হয়েছে হারকুট।

দরজা ঠেলে বেরিয়ে এলো ওদেত। দেখি একটি লোক ওদেতের সঙ্গে সঙ্গে আসছে।ওদেতকে বিরক্ত করা শুরু করেছে।ওদেত তাকে যা, ভাগ সমানে বলছে, কিন্তু সেও নাছোড়বান্দা। ওদেতকে দেখে সে ঠিক থাকতে পারছে না। হঠাৎ জড়িয়ে ধরে পর পর চুমু খেলো। আমি এবার ক্ষেপে গেলাম। চকিতে ছুটে গিয়ে রড দিয়ে তার মাথায় বাড়ি দিলাম। সে মাটিতে পড়ে গেল।

ওদেতকে তাড়া লাগালাম। নাও, আর দেরি কোরো না। ওদেত বলল, লোকটা ...

তুমি আর দাঁড়িয়ে থেকো না। যা বললাম কোরো।

পোশাকটা পাল্টে নাও। গাড়ি স্টার্ট করলাম। খানিকটা যাবার পর আর একটা গাড়ির সাথে। ধাক্কা লাগল। আজ কি কুক্ষণেই যে ভোর হল। গাড়ির ক্ষতি নিয়ে ভাবি না। এবার আর নিস্তার নেই। এদিকে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল।

মাফ করবেন স্যর চমকে চোখ ফেরালাম। বেটেখাটো চেহারার মানুষ, অন্ধকারে ঠিক বুঝতে পারিনি...।

কি বুঝতে পারোনি হাবার্ট? ভুলটা কার? এক মহিলার গলার স্বর।

আসলে মানে...

শুনব মানে টানে বাদ দাও।

বেশ মাথা নোয়ালাম আমি। এবার দয়া করে গাড়িটা একটু এগিয়ে নিন।

না, খবরদার। আমি পুলিশ ডাকছি যা করার ওরা এসে করবে।

ঘামে সমস্ত শরীর ভিজে গেল।

মন স্থির করতে দেরি হল না। শরীরের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে অ্যাকসিলারেটরে চাপ দিলাম। ঝনঝন শব্দে ছিটকে পড়লো ও-গাড়ির ভাঙা মাগার্ড।

মহিলার গলা পেলাম- নম্বরটা...হাবার্ট নম্বর।

ওদেতকে যেখানে প্যাকার্ড নিয়ে অপেক্ষা করতে বলে এসেছি, বড় রাস্তায় ওটার ঘুর-পথটা ধরে উধ্বশ্বাসে সেদিকে ছুটলাম।

টেলিফোনের শব্দে ঘুম ভাঙল।

নিনা ফোন ধরেছে।

লোন-বে থেকে বিমান ঘাঁটি প্রায় সারা পথ ওদেত প্রশ্নে প্রশ্নে জর্জরিত করেছে। তাকে অ্যাকসিডেন্টের কথা ইচ্ছে করেই বলিনি। যাক পাশের ফোন বুথ থেকে ম্যানরুক্সের বাড়িতে ফোন করলাম।

ওপাশে ফোন তুলে বলল- কাকে চাই?

মিঃ ম্যানরুক্সকে একবার ডেকে দিন।

আপনার নাম?

নাম জেনে কাজ নেই।

একটু ধরুন...।

খানিকক্ষণ বাদে ম্যানরুক্সের নিভাঁজ ভারী ভরাট গলার স্বরে বলুন।

তা মিথ্যে বলেনি রিয়া। স্বামীর ওপর আধিপত্য অস্বীকার্য নয়।

শুনুন...আপনার মেয়ে ওদেত এখন আমাদের হাতে। মেয়ের জীবন পেতে যদি চানতাহলেপচ, লাখ ডলার যোগাড় করুন। দেরি করবেন না। চালাকি করে পুলিশ-টুলিশ ডাকবেন না। বুঝলেন?

বুঝেছি...কিন্তু কখন কিভাবে দিতে হবে টাকা, যদি জানতে পারতাম...।

বলবো, সোমবার, টাকা যোগাড় করতে আপনার কতদিন লাগবে?

কাল সকালেই পেয়ে যাব টাকা।

বেশ, সোমবার আমি জানাবো। পুলিশে খবর দিলে মেয়েকে আর জ্যান্ত পাবেন না।

বাড়ি ফিরে এলাম। নিনা দরজার পর্দা সরিয়ে উঁকি মেরে বলল– হ্যারি, জনের ফোন, তোকে ডাকছে।

আর দাঁড়ালাম না, ছুটে রিসিভার তুললাম।

দারুণ খবর হ্যারি, ছশো ডলার মাইনের চাকরিটা তোমার হয়ে গেছে। এখুনি চলে এসো।

এখুনি? আজ তো রোববার।

কাজের আবার রোধ, সোম। বড়কর্তা এক্ষুনি আসবেন। একটা জরুরী, আলোচনা।

জরুরী, কি ব্যাপার?

আরে ফেলিক্স ম্যানরুক্সের মেয়ে গুণ্ডাদলের হাতে পড়েছে–এটা কি কম জরুরীখবর হ্যারি? সুতরাং, হে বন্ধু বিলম্ব করো না।

আমার গলা শুকিয়ে গেছে। শক্ত মুঠোয় রিসিভার চেপে ধরে আমি তোতলাতে লাগলাম।

না হ্যারি, তোমার কোনো ওজর আপত্তি আমি শুনছিনা। এ সুযোগ তুমি পায়ে ঠেলোনা, প্লিজ।

ফিসফিস করে বললাম, যাচ্ছি জন, এক্ষুনি যাচ্ছি।

রেনিক বলল– তাড়াতাড়ি এসো, দেরি কোরো না।

নিনা জিজ্ঞেস করলো, কি? এতো জরুরী তলব কিসের?

কি জানি কেন? চাকরিটা শেষে নিচ্ছি। মাস গেলে ছশো ডলার... এ সুযোগ পায়ে ঠেলা ঠিক না।

নিনা আমাকে জড়িয়ে ধরে আদর করল। তুমি রাজি হয়েছে দেখে খুব ভাল লাগছে আমার।

যাই চটপট, তৈরি হয়ে নিই।

রেনিকের অফিসে ঢুকলাম।

রেনিক হাসল। যাক সুবুদ্ধি হল তাহলে।

ম্যানরুক্সের মেয়ে কি হয়েছে তার?

রেনিক বলল চলল, স্যারের কাছে জানতে পারবে।

দরজা ঠেলে আমরা মিতভাজের কামরায় ঢুকলাম।

শক্ত সমর্থ চেহারা, চুল ধপধপে সাদা, হাতের আঙুলে ধরা জ্বলন্ত সিগারেট।

মিভোজ পায়ের শব্দে তাকালেন।

পরিচয় করিয়ে দিল জন।

রেনিক শুরু করলো। সকালে ম্যানরুক্স তাকে ফোনে বলেছেন আজই তার পাঁচ লাখ ডলার দরকার। গুণ্ডার দল তাকে শাসিয়েছে এ ব্যাপারে পুলিশের শরণাপন্ন হলে মেয়েকে তিনি জ্যান্ত পাবেন না।

এসব তো সবই তোমার অনুমান জন। ম্যানরুক্স তো আর বলেনি। কোন প্রমাণ কি তুমি পেয়েছো?

বাঃ তবে আর বলছি কি? এই শহরে বাস করতে এসে ম্যানরুক্স একজন বিশ্বস্ত দেহরক্ষীর জন্য আমাদের দপ্তরে আবেদন করেন। ও রিলে কে পাঠালাম। আমি ফোন করে আজ সকালে জানলাম–ম্যানরুক্সের মেয়ে কাল সিনেমায় যাবে বলে রাত পৌনে নটা নাগাদ সেই যে বাড়ি থেকে বেরিয়েছে তার পর আর ফিরে আসেনি।

সিনেমায় গিয়েছিল কি?

না, যে বন্ধুর সঙ্গে যাবার কথা, সে ফোনে করে জানায় ওদেত যায় নি।

ম্যানরুক্স জানিয়েছে আমাদের?

না, ম্যানরুক্স টাকা নিতে এলেই খবর নেব। ঘটনার মূলে তোমাকে ঢুকতে হবে। আমাদের তরফ থেকে সব রকম সাহায্যই তুমি পাবে। নীরবে মাথা নাড়লাম আমি।

রেনিককে মিডোজ বলল মেয়েটি যে গাড়ি নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল তার কোনো হদিশ পেলে?

ও রিলে বলল, মেয়ের সাথে তার গাড়িখানাও উধাও।

গাড়ি বার করতে বেশি অসুবিধে হবে না। গোয়েন্দা বিভাগে ইতিমধ্যে তুমি ঘটনাটা জানিয়ে রেখ।

রাখবো।

তোমার করণীয় কিছু নেই এখন, দুঘণ্টা পর পর রেনিককে ফোন করে জেনে নিও। আমি বললাম, ম্যানরুল্পের ওপর যদি নজর রাখি সে কোথায় টাকা দিতে যাবে।

না তা করতে গেলে বিপদ আছে।

চলি জন, চলি স্যর বলে চলে এলাম রাস্তায়।

বেলা এগারোটায় রিয়া আসবে কেবিনে। ওদেতকে ফোন করলাম। ওদিক থেকে ওদেতের সাড়া মিললো, হ্যালো?

হ্যারি বলছি। এদিকে মস্ত ঝামেলা হয়ে আছে। এখনি কিছু বলছি না। পরে বলছি। তুমি ভালভাবেই ফিরে এসো।

সেই মাতালটা কি মারা গেছে?

না, সে ভালোই আছে। আসলে পুলিশরা নাক গলিয়েছে।

তাহলে কি হবে?

দেখা যাক।

কিন্তু ...আমার যে তর সইছে না।

ফোনে এসব বলা যায় না। ছাড়ছি। নানারকম চিন্তায় ডুবে গেলাম। এমন সময় রিয়া ঢুকল।

ম্যানরুক্স ব্যাঙ্কে টাকা আনতে গেছে, আমি ওদেতের জন্য গীর্জায় প্রার্থনা করার ছুতো করে বেরিয়ে এলাম।

সোফায় রিয়া পায়ের ওপর পা তুলে বলল টাকাটা কবে নিচ্ছেন?

টাকা। আদৌ পাবো কিনা দেখি।

তার মানে?

আপনার স্বামীর ব্যাঙ্কের ম্যানেজার এবং আপনাদের বিশ্বস্ত সোফারটি পুলিশের কাছে ইতিমধ্যে সব ফাঁস করে দিয়েছে।

মিথ্যে, সব মিথ্যে আপনি বানিয়ে বানিয়ে বলছেন, ধাপ্পাবাজ আপনি।

আপনাকে গল্প শোনাবার মত প্রবৃত্তি আমার নেই। আমার কথা বিশ্বাস না হয়, খোঁজ নিন।

আপনি জানলেন কি করে?

আমার নতুন চাকরির কথা থেকে শুরু করে–সবই তাকে বললাম।

পুলিশ নিঃসন্দেহ যে ওদেত গুণ্ডাদের হাতে পড়েছে।

হতাশ হয়ে রিয়া কাঁপতে কাঁপতে চেয়ারে বসে পড়লো। কি হবে তাহলে, টাকা আমার চাই-ই।

আমি কিন্তু তখনই জানতাম, পুলিশের চোখে আমরা ধুলো দিতে পারব না। দাঁড়ান সাড়ে এগারোটায় রেনিককে ফোন করে পুলিস কতদূর কি করলো, জেনে নিই।

রেনিকই ফোন ধরল।

কতদূর এগোলে জন?

গাড়ির খোঁজ চলছে। ম্যানব্রুক্স টাকা নিয়ে গেছেন। তিনটে নাগাদ ফোন কোরো।

করবো।

রিয়াকে বললাম, গাড়িটা এখনো ওরা খুঁজে পায়নি। আপনার বাড়িতে চিঠির বাক্স আছে তো?

আছে।

ঢুকবার সময় এই খামখানা বাক্সে ফেলে যাবেন। সাবধান দস্তানা পরে নেবেন।

তাহলে সত্যি সত্যি কাজটা আপনি করছেন?

করবো না কেন। ওদেত কাল চলে আসবে। কেবিনে পৌঁছে এখানে অপেক্ষা করবে সে। আপনিও এসে যাবেন, ভাগ করে নেবেন টাকাটা।

রিয়া ঘাড় নাড়লো- বেশ, তাহলে ঐ কথাই রইলো।

হ্যাঁ, ওরিলকে চোখে চোখে রাখবার চেষ্টা করবেন। ও পুলিশের চর।

রিয়া একদৃষ্টে আমাকে দেখল। বারান্দা থেকে নামার সময় সে এক চমক আবার দেখলো। তারপর হনহন করে চলে গেল।

মনের মধ্যে কোথায় যেন সন্দেহের একটা কাটা খচখচ করে উঠল।

বৃষ্টিটা ধরতে বিল হোল্ডেনের অফিসে টাকাটা দিতে গেলাম।

কাজ কেমন এগোচ্ছে?

এগোচ্ছে কাল রাতেই শেষ হয়ে যাবে।

বিলের অফিস থেকে বেরিয়ে সোজা ঢুকলাম ছোট্ট রেস্তোরাঁয়। খাওয়া সেরে কেবিনে ফিরলাম সোয়া দুটো।

বাড়িতে ফোন করলাম।

নিনা ফোন ধরলো–চাকরিটা হয়েছে হ্যারি?

হয়েছে।

তুমি বাড়ি ফিরছ কখন?

ঠিক নেই, জন যা কাজ দিয়েছে, কালঘাম ছুটে যাচ্ছে।

নিনা হেসে উঠল।

রেনিককে ফোন করলাম। ও তুমি আমায় বাঁচালে হ্যারি। সোজা লোন বে-তে চলে যাও, এক্ষুনি রওনা হতে হবে। গাড়ি পাওয়া গেছে।

আমি নির্বাক, দাঁড়িয়ে রইলাম নির্বাক স্থানুর মতো।

সাদা গাড়িখানি ঘিরে তিনজন পুলিশ গোয়েন্দা। রেনিক দাঁড়িয়ে আছে একপাশে।

গাড়িটা মিস ম্যানরুক্সেরই তো? আলবৎ, সব মিলে যাচ্ছে। হাতের ছাপ নিতে লোকজন আসবে। চলো, ম্যানরুক্সের সাথে দেখা করে আসি। তোমার গাড়িতেই চলো। দশ মিনিট পরে ম্যানরুক্সের বাড়ির ফটকে গাড়ি থামালাম। বাড়ি তো নয় যেন এক দুর্গ।

মিস ম্যানরুক্স বাড়িতে আছেন? রেনিক বলল।

না বেরিয়েছেন।

কখন ফিরবেন?

জানি না।

একবার মিঃ ম্যানরুক্সের সঙ্গে দেখা করতে পারি?

না, উনি অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়া কারুর সাথে দেখা করেন না।

বলো পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স থেকে লেফটেন্যান্ট রেনিক এসেছে।

একমিনিট স্যর খবর দিচ্ছি।

–আসুন স্যর, সোজা এই পথ ধরে চলে যান।

২. সদর দরজায় খানসামা

সদর দরজায় খানসামা দাঁড়িয়ে। বেতের একটি চেয়ারে সমুদ্রের দিকে মুখ করে বসে আছে রিয়া। তার মুখোমুখি বসে আছেন এক বৃদ্ধ। অনুমানে বুঝলাম ইনিই মিঃ ম্যানরুক্স।

মিঃ ম্যানরুক্স?

আমিই।

মিস ম্যানরুক্সের খোঁজে আমাদের আসতে হল।

হঠাৎ তার খোঁজে আপনাদের কি দরকার পড়লো।

দরকার আছে মিঃ ম্যানরুক্স। কাল শেষরাতে এক বৃদ্ধ গাড়ির ধাক্কায় ভীষণভাবে জখম হয়েছিল। একটু আগে লোন বে-তে পুলিশ মিস ম্যানরুক্সের গাড়ি পরিত্যক্ত অবস্থায় দেখতে পায়। গাড়ির বাঁ দিকের দরজাটা ভাঙা।

মাথা নাড়লেন। না আমার মেয়ে যদি কাউকে ধাক্কা মারতো, সে পালিয়ে যেত না, তাছাড়া ও পালিয়ে যায়নি। হয়তো কোন বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াতে গেছে। আজকালকার ছেলেমেয়ে বাবা মাকে জানিয়ে কিছু করেনা।

কবে ফিরবেন তিনি? প্রশ্ন করলো রেনি।

জানিনা, শুনুন কারুর ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানো আমি পছন্দ করিনা। মেয়ে ফিরলে আমি বরং আপনাদের খবর দেব।

গাড়ি বারান্দার দিকে হাঁটতে হাঁটতে গজগজ করতে লাগল–আমাদের কথাটা মোটে গ্রাহ্যের মধ্যে আনলো না। চেপে গেল।

চেপে যাওয়ার ব্যাপারটা নাও ঠিক হতে পারে। হয়তো মেয়ে গুণ্ডাদের হাতে পড়েনি।

মিস ম্যানরুক্স যে বিপদে পড়েছেন, এ ব্যাপারে সন্দেহ নেই আমার।

মিভোজ-এর হেডকোয়ার্টারের কামরায় আবার বৈঠক বসল। না, এখন আমাদের করণীয় কিছুই নেই। কিছু করতে গিয়ে মেয়েটার কিছু হলে মিঃ ম্যানরুক্স কাউকে ছেড়ে কথা বলবেন না। আলোচনা শেষ হলো। বাড়ির পথ ধরলাম। ঢাকা বারান্দায় নিনা বসে ফুলদানিতে রঙ করছিল। হাতের কাজ ফেলে ছুটে এসে আমার গলা জড়িয়ে ধরলো।

গাল টিপে নিনাকে আদর করলাম। রেনিকের সঙ্গে ম্যানরুক্সের ব্যাপারটা সবটাই নিনাকে বললাম নিজের অংশটুকু ছাড়া।

রাতের খাবার খেয়ে আবার বেরোলাম। ফোন বুথ থেকে ওদেতকে ফোন করলাম। হ্যারি বলছি, শোনো কাল রাত এগারোটার প্লেনে তুমি রওনা হচ্ছ। আমি থাকবো, কেবিনে যাবো। তুমি থাকবে, আমি থাকব না।

তুমি বলছে, সব ঠিক ঠিক হবে।

আলবৎ।

হেডকোয়ার্টার্সে ফোন করলাম। রেনিক নেই, বাড়ি গেছে। তার মানে কোনো খবর নেই।

পরদিন সকাল নটার পর গেলাম অফিসে। শুরু হল আবার কর্মজীবন।

এগারোটার সময় রেনিক এল–কি, কাজকর্ম কেমন লাগছে?

ভালো। নতুন খবর আছে নাকি?

না, লোন বে-তে পুলিশ মোতায়েন আছে।

ম্যানরুক্স যদি সত্যি সত্যি অতোগুলো টাকা গুণ্ডার হাতে তুলে দেন, আমরা তো কিছু জানতেও পারবো না।

তার টাকা তিনি দেবেন, ভয় ওঁর মেয়েকে নিয়ে। হয়তো টাকার বিনিময়ে তিনি তার মেয়েকে জীবিত ফিরে পাবেন না।

রেনিক চলে যেতে একটি সিগারেট ধরালাম।, কাল সকালেই আসছে পঞ্চাশ হাজার ডলার।

ফাইলপত্র রেখে বেরোবো, এমন সময় রেনিক ঢুকলো। তার মুখে-চোখে চাপা উত্তেজনা। কিছু ঘটেছে বুঝলাম।

বুঝলে হ্যারি একেই বলে কপাল।

পাইরেট্স কেবিনের কাছাকাছি পাহারাদার কনস্টেবল এক রিপোর্ট দিয়েছে একটি লোককে নাকি কেবিনর উল্টোদিকের গাড়ি রাখার জায়গায় অজ্ঞান অবস্থায় পাওয়া গেছে।

গলা শুকিয়ে কাঠ। তারপর?

তারপর আর কি? লোকটাকে নাকি একটি মেয়ের পেছন পেছন বেরোতে দেখেছে। মেয়েটি আর কেউ নয়, স্বয়ং ওদেত ম্যানরুক্স।

সে চিনতো তাকে?

বাঃ ওকে কে না চেনে? কাগজে ছবি বেরোচ্ছে।

সেই মাতালটি?

মাথার জখম নিয়ে সে হাসপাতালে। গেলাম দরোয়ানের কাছে। মিস ম্যানরুক্সের ছবি দেখে দরোয়ান বলল, হ্যাঁ স্যর, এরই পেছন পেছন সেই লোকটা বেরিয়েছিলো।

মিস ম্যানরুক্স কখন ঢুকেছিলেন কেবিনে?

ধরুন,...নটা নাগাদ?

তারপর কি হলো!

মিনিট দশেক পর একজন খবর দিলো একটা লোক নাকি মুখ থুবড়ে আছে।

মিস ম্যানরুক্স কারোর খোঁজে কেবিনে ঢুকেছিল?

সেরকমই তো মনে হয়?

পরণে কি ছিলো তার।

নির্ভুল বর্ণনা দিলো সে।

উঠে দাঁড়ালো রেনিক হাসপাতালের সেই লোকটার সঙ্গে একবার দেখা করে এলে মন্দ হয় না। কি যেন, নাম তার?

ওয়াস্টার কার্বি।

চলো হ্যারি, কাজটা সেরে আসি।

বিছানায় চিত হয়ে শুয়ে আছে ওয়াস্টার। আমাদের দেখে ব্যস্তসমস্ত ভাবে উঠে বসলো সে।

সেদিন স্যর, একটু বোধহয় বেসামাল হয়ে পড়েছিলাম। মেয়েটাকে দেখে ঠিক থাকতে পারিনি। ধাঁ করে আমার মাথায় কে এসে ঘা দিল। আমি, জ্ঞান হারালাম।

কেমন দেখতে সে?

বুকটা ধক করে উঠলো আমার।

লম্বা চওড়া জোয়ান চেহারা, কিন্তু ...

আবার দেখলে চিনতে পারবে?

না, না স্যর, চেনা সম্ভব নয়।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বিড়বিড় করল রেনিক, বান্ধবীর সাথে দেখা করার কথা রাত নটায়, উলটে হাজির হল কেবিনে, কেন?

হয়তো বাড়ি থেকে বেরোবার আগে কোন ফোন পেয়ে থাকবে।

হ্যাঁ, যুক্তি হিসেবে এটাই একমাত্র সম্ভব। ও'রিলেকে বলতে হবে। সে হয়তো কিছু বলতে পারে। ফেরার পথ চুপচাপ কাটলো। বিকেল পাঁচটা নাগাদ ঘরে ঢুকলো রেনিক, ও'রিলেকে ফোন করলাম। বলল, মিস ম্যানরুক্স বেরোবার মিনিট পাঁচ আগে একটা ফোন আসে। রাত পৌনে নটায়। জেরী উইলিয়ামস-এর ফোন। জেরী মিস ওদেতের বন্ধু। ওকে ভাবলাম জিজ্ঞাসাবাদ করবো। কিন্তু মিতোজ নিষেধ করলো।

কেশে গলা পরিষ্কার করে বললাম। তা আমার কি এখন আর থাকার দরকার আছে?

কাছাকাছি থাকলে কাজের সুবিধে–এই আর কি।

আসলে একটা পার্টিতে যাবার কথা।

একথা আগে বলবে তো, কোথায় পার্টিটা।

আগে থেকেই চিন্তা করে রেখেছিলাম। বললাম- ক্যাসিনো রেস্তোরাঁয়। রাতভর পার্টি।

রেনিক চলে যেতে ফোন তুলে বাড়ির নম্বর ঘোরালাম।

নিনা আজ আমার ফিরতে একটু রাত হবে। এক্ষুণি বেরোতে হবে, রাত দুটোর পর আমি বাড়ি ফিরবো। ছাড়ছি।

অফিস থেকে বেরিয়ে সোজা গেলাম কেবিনে। একটা বাজতে মাত্র দশ মিনিট বাকি।

রাতের শহর ঘুমোচ্ছে। বিমানবন্দর থেকে যাত্রী বাস আসতে এখনও মিনিট পনেরো দেরি।

অফিসে সার্জেন্ট হারল্ড জানালেন, একটু আগে রেনিক বাড়ি চেলে গেছে। নিশ্চিন্ত মনে ওদেতের বাড়িতে ফোন করলাম।

টাকা যোগাড় হয়েছে?

হ্যাঁ?

বেশ, ঠিক দুটোর সময় আপনি বাড়ি থেকে বেরোবেন। নিজের রোলস নিজেই চালাবেন। রাস্তার কোনো এক জায়গায় তিনবার টর্চের আলোর সঙ্কেত দেখতে পাবেন। দেখামাত্র টাকার ব্যাগ জানালা গলিয়ে রাস্তায় ছুঁড়ে দেবেন। আপনার মেয়ে আধ ঘন্টার মধ্যে লোন বে-তে পৌঁছে যাবেন। তিনটে নাগাদ তাকে দেখতে পাবেন। যদি সেখানে না পান, মেয়ে বাড়িতেই যাবে।

হু, তারপর?

তারপর আর কি? মেয়ে ভালো আছে। স্ত্রী হিসেবে যেমনই হোক রিয়া, স্বামীর ওপর তার যে আধিপত্য আছে তা বোঝা গেল।

নিজের দিক থেকেও নিশ্চিন্ত হলাম। ব্যাঙ্কের লকারে রাখা সেই দুখানি টেপ মা মেয়েকে ফাসাবার পক্ষে যথেষ্ট। অবশ্য কাজ যেভাবে এগোচ্ছে, তাতে টেপের দরকার হবেনা, টেপ যেখানে আছে, থাকবে। একটা বেজে পাঁচ-পঁচিশটা বাস ক্রমে থামল। একে একে সকলে নামলো।

দূর থেকে একচমক দেখেই চিনলাম ওদেতকে। পরনে সেই নীলের ওপর সাদা স্কার্ট। আমাকেই খুঁজছে।

হাত নেড়ে ইশারা করলাম।

চলো, গাড়ির দিকে পা বাড়ালাম আমি। পেছন থেকে একটা ভারি হাত এসে পড়লো আমার কাঁধে।

নিমেষে যেন এই বিরাট পৃথিবী দুলে উঠল। শক্ত বলিষ্ঠ চেহারা, হ্যারি তুই না সেদিন জেলে গেলি?

ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো আমার।

টিম কাইলি। হেরাল্ডের একজন জাঁদরেল সাংবাদিক। একে চেনেনা, সংবাদপত্র জগতে এমন কোন লোক নেই।

বাপরে বাপ, এমন ঘাবড়ে দিয়েছিল। ...ওদেত ঠায় দাঁড়িয়ে আছে।

কেমন আছিস, বল?

ভালো তোমার খবর কি?

এই চলছে একরকম।

ইনি কে?

আমার স্ত্রী নিনার বান্ধবী।

ওদেত তাড়াতাড়ি চলে গেল। এ কিরে হ্যারি, ও অমন তড়িঘড়ি ছুটলো। ব্যাপার কি?

আসলে বড় লাজুক।

হয়ত তাই, ভয়ে যেন একেবারে সিঁটিয়ে গেছে। তোর গাড়ি আছে তো, আমাকে প্লাজা হোটেলে নামিয়ে দিয়ে যা না।

দুঃখিত, আমরা উলটো দিকে যাবো।

চাকরি বাকরি কিছু করছিস নাকি?

হ্যাঁ, পুলিশে।

সময় সুযোগ পেলে একদিন বউকে নিয়ে লস-এঞ্জেলসে যাস।

যাবো, গুড নাইট।

.

গাড়িতে খুব বকলাম ওদেতকে, তোমার কোনো বুদ্ধি নেই, চলে যেতে পারলে না, দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

বাঃ, ও বুঝি আগে থেকে দেখেনি?

যাকগে, যা হবার হবে।

আমি ভেবে পাচ্ছি না, পুলিশের কথা বললে তুমি কালবাবা, বাবা কিছু ...

নাঃ, তোমার বাবা এখনও মুখ খোলেন নি। গাড়ির ধাক্কা থেকে শুরু করে ব্যাঙ্কের ফোন, মিতভাজের ধারণা সবই বললাম।

লোন বে-তে অমন একটা কাণ্ড ঘটলো। তুমি তো সেদিন আমায় কিছু বললে না।

যা যা শিখিয়েছিলাম, মনে আছে তো?

মনে আছে।

দুটো বাজতে কুড়ি মিনিটের সময় কেবিনের সামনে গাড়ি রাখলাম।

যাও পোশাক পাল্টে, হাত পা ধুয়ে সুস্থ হয়ে নাও।

গাড়ি থেকে নেমে অবার পিছিয়ে এসে ওদেত বলল, আমাকে আদর করলে না।

একটু ইতস্ততঃ করলাম। তারপর দুহাতে গলা জড়িয়ে তার কবোষ্ণ ঠোঁটে ঠোঁট রাখলাম। কিছুক্ষণ পর আলিঙ্গন মুক্ত হলাম।

বিয়ের আগে তোমার সাথে কেন দেখা হল না, হ্যারি?

ভাগ্য। বলে গাড়ি ছাড়লাম।

গাড়ি পিছিয়ে ঝোঁপের আড়ালে রাখলাম। কিন্তু ম্যানরুক্স যদি আমাকে ধোঁকা দেয়। যদি সঙ্গে করে ও'রিলেকে নিয়ে আসে!দূরে হেডলাইটের জোরালো আলো দেখা যাচ্ছে। সে আসছে।

রোলস রয়েজ। হ্যাঁ, ম্যামরুক্স একাই এসেছে। আর মাত্র পঁচিশ গজ দূরে গাড়িখানা টর্চটা মাটির সঙ্গে মিলিয়ে তিনবার সুইচ টিপলাম। এক সেকেন্ড,... দু সেকেন্ড...কালো একটা অ্যাটাচি জানলা গলে রাস্তায় আছড়ে পড়লো। গাড়ির গতি না কমিয়ে চলে গেল।

আমার সামনে হাত পাঁচেক দূরে আছে অ্যাটাচি। একমিনিট অপেক্ষা করলাম। তারপর এক ঝটকায় অ্যাটাচি নিয়ে নিলাম।

কেবিনের পাশে গাড়ি রাখলাম। ঘড়িতে তখন তিনটে বাজতে পঁচিশ মিনিট বাকি। রিয়ার তো এতক্ষণে পৌঁছে যাবার কথা। কেবিন অন্ধকার। আলো জ্বালেনি ওদেত। আলো জ্বালার বিপদও অনেক। সিঁড়ি ভেঙে উঠলাম বারান্দায়।

না বারান্দায় ওদেত নেই।

আশ্চর্য গেলো কোথায় সে? বৈঠকখানায়... ওদেত। দরজা খোলো।

কোনো সাড়া নেই।

আশ্চর্য হলোটা কি!

দরজায় ধাক্কা দিতে গিয়ে আর এক বিস্ময়! দরজা খোলা। নির্ঘাত ঘুমিয়ে পড়েছে মেয়েটা চিন্তা ভাবনা ঘুমোবেই তো। আলো জ্বালোম, না ওদেতের চিহ্নমাত্র নেই। অ্যাটাচি টেবিলে রেখে শোবার ঘরের দরজায় টোকা দিলাম।

দরজা খুলে দেখলাম ওদেত ঐ পোশাকেই শুয়ে আছে বিছানায়।

ওদেত, এই ওদেত চাপা স্বরে ডাকতে ডাকতে এগোলাম।

ঠেলতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পর্শের মত সরিয়ে আনলাম হাত, মুখের কথা মুখেই রয়ে গেলো।

ওদেত...ওদেতের গা ঠাণ্ডা। ঝুঁকে পড়লাম। তার মুখের ওপর। ছিটকে সরে এলাম।নাইলনের একটা মোজা শক্ত পাক খেয়ে জড়ানো রয়েছে গলায়–ওদেত মারা গেছে।

স্বপ্ন নয়, বাস্তব। খুন-হা ওদেত ম্যানরুক্স খুনই হয়েছে। আমার সমস্ত চেতনা পঙ্গু, টলতে টলতে কোনোমতে দেয়াল আলমারিটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। স্কচের একটা বোতল তুলে নিলাম মুঠোয়, ছিপি খুললাম তারপর বোতল উপুড় করলাম গলায়।

রিয়াকে ফোনে খবর দেবার জন্য তৈরি হলাম। খানসামা ফোন তুললো। হয়ত এতোক্ষণ ঘুমায়নি সে, হয়তো ম্যানরুক্সের ফিরে আসার জন্যই অপেক্ষা করবে।

কে বলছেন? কাকে চাই?

মিঃ হ্যামন্ড..। মিসেস ম্যানরুক্সকে একবার লাইনটা দিন। নাম বললেই উনি বুঝতে পারবেন।

উনি ঘুমোচ্ছন মিঃ হ্যামন্ড।

খুব জরুরী দরকার।

দুঃখিত, মিসেস ম্যানরুক্স অসুস্থ। বলেছেন ঘুমের মধ্যে যেন ওঁকে বিরক্ত না করা হয়।

ও আচ্ছা, ঠিক আছে।

তাহলে কি সত্যি সত্যিই রিয়া অসুস্থ হয়ে পড়লো। কিছুই ঠিক ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। কোথায় একটা খটকা লাগছে। ম্যানরুক্সও হয়তো এতোক্ষণে লোন বে-তে পৌঁছে গেছেন। পুলিশ যদি একবার পেছনে লাগে, তাহলে খুনের অপরাধ আমার ঘাড়ে চাপাতে তারা ইতস্ততঃ করবে না। ওদেতের মৃতদেহ কোনমতেই এখানে পড়ে থাকতে দেওয়া চলবে না। সব ছেড়ে গেলে হয়তো আজ আমি বাঁচবো।কিন্তু কাল, পরশু?বিল হোল্ডেন তো দেখেছে। পুলিশে খবর দেবে সে, পুলিশ আসবে।হ্যাঁ, এক্ষেত্রে রিয়াই পারে আমাকে বাঁচাতে। আগাগোড়াব্যাপারটি নিয়ে ওর সঙ্গে একদফা আলোচনা করতে হবে। ওদেতের মৃতদেহের আপাতত একটা সঙ্গতি করা দরকার। এমন একটি জায়গায় লুকিয়ে রাখতে হবে যেখানে সচরাচর কেউ যায় না। রিয়ার সঙ্গে আগে কথাবার্তা বলি, কি তার মতামত–জেনে নিই। তারপর নয় সেরকম বুঝলে পুলিশে খবর দেবো।

বিছানার চাদর মুড়ে মৃতদেহ নিয়ে এলাম বাইরে। ডালা খুলে গাড়ির ট্রাঙ্কে শুইয়ে দিলাম, ডালা নামিয়ে চাবি বন্ধ করে ফিরে এলাম শোবার ঘরে।

বোতলের বাকি পানীয়টুকু গলায় ঢেলে মন অনেকটা চাঙ্গা হল।

আলো নিভিয়ে বেরোতে যাব, চোখ পড়লো অ্যাটচিটার ওপর। বাঁ হাতে অ্যাটাচি তুলে বাইরে এলাম। তালা লাগিয়ে উঠে বসলাম গাড়িতে। এখন তিনটে বেজে দশ। গাড়ির গতিবেগ কখনো চল্লিশের ওপর তুলবো না।

বড় রাস্তায় উঠে গাড়ির গতিবেগ একটু বাড়িয়ে দিলাম।

তেমাথার মোড়ে এক ট্রাফিক সিগন্যাল। গিয়ার বদলে ডাইনে মোড় নেব। সবুজ আলোর সঙ্কেতটা মুহূর্তে রক্তচক্ষু মেলে আমার দিকে কটমট করে তাকালো।

ব্রেক কষলাম। সবুজ। প্রাণপণ চেষ্টায় নিজেকে স্বাভাবিক রেখে গিয়ার বদলে অ্যাকসিলারেটরে চাপ দিলাম। হঠাৎ এক প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খেয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো।

আমার মনের অবস্থা সঙ্গীন এখন। গাড়ি অচল, অনড়।

ততক্ষণে সিগন্যালের আলো সবুজ থেকে লালে পালটেছে। আড়চোখে তাকালাম পুলিশটার দিকে। হেলতে হেলতে সে এগিয়ে আসছে পায়ে পায়ে।

আলোর সঙ্কেত লাল থেকে আবার সবুজ।

কি মশায়? রাতভর এখানেই থাকার মতলব?

না, মানে গিয়ারটা বোধ হয় গেছে।

তা এভাবে পথে দাঁড়িয়ে থাকলে, চলবে?

গ্যারেজ-ট্যারেজ খোলা পাব?

দেখি, লাইসেন্স দেখি।

পুলিশের প্রেসকার্ডখানাও দেখালাম। দেখো কাণ্ড, একথা তো আগে বলতে হয়।

পুরনো হলেও গাড়ি কিন্তু বেশ মজবুত।

কয়েক মুহূর্ত নীরবতা।

আছে গ্যারেজ মাইলখানেক দূর।

ফোন করে দেখুন।

নম্বরটা?

আছে ডায়ারিতে লেখা আছে। দাঁড়ান।নম্বর লিখে সেবলল, এক্ষুনি যেন ওরা ক্রেন পাঠিয়ে দেয়। আমার নাম শুনলে ওরা আর আপত্তি করবে না।

উল্টোদিকে ফোন বুথ থেকে ফোন করলাম। সবে বলে নিজের জায়গায় এলাম। কি, রাজি হয়েছে?

হা হয়েছে।

একের পর এক চিন্তা এসে ভিড় করলো।

গাড়ি তো নিয়ে যাচ্ছি বাড়িতে?নিনা যদি হঠাৎ দেখে ফেলে মৃতদেহ!যা কিছু করবো রাত্তিরে।

মিনিট পনের পর গ্যারেজ থেকে ব্রেকডাউন ভ্যান এসে হাজির। মেকানিক ছোরাটা নামলো। পরীক্ষা করে বললো। গিয়ারটা গেছে। সারাতে দুসপ্তাহ লাগবে।

সারানো টারানো নয়, গাড়িখানা আগে বাপু তুমি আমার বাড়ি অবধি পৌঁছে দাও। পরে সারানোর কথা ভাবা যাবে।

তার মানে? চমৎকার, গাড়ি সারাবে আর একজন, আর আমি পৌঁছে দেব, মাঝরাত্তিরে ডেকে আমার সঙ্গে রসিকতা? এসব ফালতু কাজ আমার দ্বারা হবে না।

বেশ হবে না যখন যাও। পুলিশ হেড কোয়ার্টারের কোন অফিসারকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করার বিপদ অনেক, মনে রেখো।

এতেই কাজ হল। তেমাথার থেকে বাড়ি মোট চার মাইল। চুপচাপ গাড়িটা ভ্যানের সঙ্গে বসে এলাম।

আমি দরজা তালাবন্ধ করে পকেট থেকে, ম্যানিব্যাগ বের করলাম।

কত?

পনেরো ডলার।

না আছে মাত্র এগারো ডলার।

নিলো সে। ততক্ষণে ভোর হতে শুরু করেছে। ঘরের আলো নিভিয়ে বাথরুমে ঢুকে ঝাঁঝরি খুলে দিলাম।

পাজামার দড়িটা সবে বেঁধেছি, এমন সময় ফোনটা বেজে উঠলো।

রিসিভার তুললাম- হ্যালো?

হ্যারি। রেনিকের গলা ভেসে এলো। একটু আগে ম্যানরুক্স ফোন করেছিলেন। এবার আর লুকোচুরি নয়–পরিষ্কার বললেন–মেয়ে তার গুণ্ডাদলের হাতে পড়েছে। তুমি এক্ষুনি হেড কোয়ার্টার্সে চলে এসো।

ঘামে ভিজে উঠলো শরীর।

দশ মিনিটের মধ্যে আমি গাড়ি পাঠাচ্ছি। তুমি তৈরি হয়ে নাও।

ঘাড় ঘোরাতেই চোখাচোখি হল নিনার সঙ্গে।

কে...কে হ্যারি?

জনের ফোন। এক্ষুণি হেডকোয়ার্টার্সে যেতে হচ্ছে।

একটু কফি করি তোমার জন্য?

থাক।

কেন, থাকবে কেন?

পোশাক পাল্টে টাইয়ের নট বাঁধছি, বাইরে জীপ এসে থামলো।

নিনাকে ছোট্ট করে চুমু খেয়ে উঠে বসলাম গাড়িতে।

অফিসে অপারেশন রুমের টেবিলে একখানি ম্যাপের ওপর হুমড়ি খেয়ে রয়েছে তারা তিনজন রেনিক একগাল হেসে বলল–ম্যানরুক্স যেহেতু মেয়েকে পাননি, তাই আমাদের শরণাপন্ন হয়েছেন।

আমি নিশ্চুপ। ম্যানরুক্স সবই বলেছেন। কোথাও মেয়েটি নেই।

আমি যাচ্ছি আর হ্যারিকে নিয়ে ম্যানরুক্সের সাথে একবার দেখা করে আসি।

বান্টি বলল- কেন জানিনা, মনে হচ্ছে মেয়েটিকে জীবিত পাব না। এরজন্য দায়ী তার বাবা, তিনি প্রথম থেকে আমাদের বললে, এতদূর গড়াতো না।

না, বাবা ভুল করেননি। এই কুকীর্তির নায়ক এ শহরেরই লোক।

আমিও তাই মনে করি।

এরকম ধারণার কারণ? আমি বললাম।

কারণ একটা নয়। অজস্র। জেরী উইলিয়ামসের ফোনের কথাটাই ধরা যাক। বেচারা প্রায় পনের দিন যাবৎ বিছানায়, শয্যাশায়ী। তিনি বললেন জেরীর তাদের বাড়ি যাওয়া বা তার মেয়েকে ফোনটোন করা বন্ধ হয়েছে। তার মানে গুণ্ডারা জানে ওদেতের সাথে ঘনিষ্ঠতার কথা জেরীর। পাইরেটস্ কেবিনের নামও এ শহরের লোক ছাড়া কেউ জানে না।

আমরা ম্যানরুক্সের বাড়ি গিয়ে পৌঁছলাম। আমাদের দেখে ক্লান্ত চোখ দুটো তুলে তাকালেন ম্যানরুক্স, কি মেয়ের মৃত্যু সংবাদ শোনাতে এলেন নাকি?

মেয়ে আপনার জীবিতই আছে। মেয়েকে আপনি শেষ কখন দেখেছিলেন।

শনিবার কুড়ি মিনিট আগে বান্ধবীটি জানালো ওদেত সিনেমায় যায়নি। অবাক হলাম। তারপর গুণ্ডাদলের একটি লোক ফোন করলো। সোমবার সকালে ওদেতের একটি চিঠি পেলাম। এই সেই চিঠি। হাতের লেখা আপনার মেয়েরই তো?

হ্যাঁ। গিয়ে দেখি ওদেত নেই। এখানে এসে দেখি, সে নেই। অগত্যা আপনাদেরশরণাপন্ন হলাম।

আচ্ছা যে লোকটা আলোর সঙ্কেত দেখাচ্ছিলো, তাকে আপনি দেখেন নি?

না আলোটুকুই দেখেছি, লোকটাকে দেখিনি।

জায়গাটা একবার পরীক্ষা করে দেখলে হতো। আপনি যদি সঙ্গে...।

দুঃখিত লেফটেন্যান্ট। আমি অসুস্থ।

আমি জানতাম, এ প্রশ্ন আপনারা করবেন।

আমি সেই জায়গাটার একটানশাকরে রেখেছি টেবিলের ড্রয়ার খুলে একখানা কাগজ দিলেন।

বান্টির হাতে কাগজখানি দিলো রেনিক। ফ্রেড, ব্যারিকে নিয়ে এক্ষুনি তুমি ইস্ট বীচ রোডে চলে যাও। গাড়িটা বরং পাঠিয়ে দিও আমি আর ওখানে যাবোনা সোজা হেড কোয়ার্টার্সে ফিরবো।

কলের পুতুলের মতো বান্টির পেছন পেছন গিয়ে উঠলাম গাড়িতে।

ইস্ট রোডের সেই ঝোঁপ। নকশা মিলিয়ে সঠিক জায়গাতে পৌঁছতে বান্টির মত ঝানু পুলিশ অফিসারদের এতটুকু অসুবিধে হলো না।

সূচিপত্র

শুরু হল তদন্ত।

বিড়বিড় করলো বান্টি, বুঝলেন মিঃ, লোকটা যে এখানেই লুকিয়েছেন সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। এই দেখুন তার জুতোর ছাপ। আপনি চটপট দুজন ফোরেনসিক অফিসার পাঠাবার ব্যবস্থা করুন। মাথা হেলিয়ে দেরি করলাম না। গাড়ি ছাড়লো। নিজস্ব বলতে আর কিছু নেই। ফটকের বাইরেই রেনিকের দেখা পেলাম।

রেনিকের হাতে একটা অ্যাটাচি।

বুঝলে হ্যারি, এটারও একটা ছবি ছাপতে হবে। ম্যানরুক্স কিনেছিলেন একজোড়া অ্যাটাচি। একটিতে রেখেছিলেন টাকা, আর একটা রেখে দিয়েছেন নিজের কাছে।

বান্টি ওখানে গিয়ে কিছু পেল?

সব ঘটনাই তাকে বললাম।

দু আঙুলের ফাঁকে ধরা জ্বলন্ত সিগার, চোখের দৃষ্টি খোলা ফাইলের পাতায় স্থির নিবদ্ধ।

চেয়ার টেনে মুখোমুখি বসলাম আমরা। ওদেত ও অ্যাটাচির ছবি কাগজে ছাপাবার কথা রেনিক বলল।

ঘাড় নাড়লেন মিতোজ। ততক্ষণে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ভোলা ওদেতের গাড়ির একরাশ

ছবি তৈরী করে ফেলেছে রেইগার।

পরের তিনঘণ্টা দম ফেলার ফুরসত পাচ্ছি না। কাগজের অজস্র প্রতিনিধির প্রেস বিজ্ঞপ্তি নিতে আসার অনুমতি প্রার্থনা করে ফোন। কাকে বাদ দিয়ে কাকে অনুমতি দেবো–এটাই এক সমস্যা। এককালের সাংবাদিক আমি মোটামুটি সবাই আমার পরিচিত। ততক্ষণে রিপোর্ট আমার তৈরি।

ফোন বাজলো-হ্যালো?

নিনার স্বর–হ্যারি, গাড়ির চাবিটা তখন থেকে খুঁজছি–পাচ্ছি না। তুমি, তুমি নিয়েছে নাকি!

আর বল কেন! তাড়াহুড়োর মধ্যে গাড়ির কথা তোমাকে বলা হয়নি। কাল রাতের দুরবস্থার কথা সবটাই বললাম।

ইস, আমি তাহলে কি করি। একগাদা পুতুল, ফুলদানি জমেছে, দোকানে আজই পৌঁছে দেবার কথা...গ্যারেজে একটা খবর

না, তুমি বুঝতে পারছেনা নিনাগিয়ারের গোলমাল সারাতে গেলে এখন একরাশ টাকার দরকার। তুমি বরং একটা ট্যাক্সি দেখে নাও। বাড়ি ফিরে যা করার করবো। ছাড়ছি।

দরজায় টোকা পড়লো।

কে?

আসতে পারি, হুজুর? দরজা ঠেলে টিম কাইলি ঢুকলো। ঢোক গিলোম আমি।

এসে কোনো লাভ নেই টিম, আমার কাছে কোনো খবর নেই।

সত্যি করে বল, মেয়েটা মারা গেছে, তাই না? আমাদের অনুমান, সে আর বেঁচে নেই।

তা তোদের ম্যানরুক্স কি বলেন?

কি আর বলবেন। সহজ ভাবেই পুরো ব্যাপারটা মেনে নিয়েছেন।

আর তার যুবতী স্ত্রী–তার কি খবর?

তিনি শয্যা নিয়েছেন।

বলিস কি? সত্যি?

বাঃ মিথ্যে বলে আমার লাভ!

ওঃ, কত ভড়ংই যে জানে মাগী!

কেন?

ম্যানরুক্স তো ফরাসী,...আইনটা তুই পড়িসনি?

না মানে...।

কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি হিসেব মত বউ মেয়ের আধাআধি পাবার কথা। তো মেয়ে যদি সত্যি মরে গিয়ে থাকে তাহলে ভাগীদার বলতে রইল ঐ হারামজাদী, দুহাতে সব টাকা ভোগ করবে।

এবার আগাগোড়া ব্যাপারটা আমার চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠল।

ওদেত মারা গেছে রিয়ার চক্রান্তে। টিম বলে উঠল কিরে, গুম মেরে গেলি কেন?

না মানে...কথা শেষ করার আগেই টেলিফোনের আওয়াজ হল। মিতোজের ভরাট গলা এল। এক্ষুনি একবার আমার ঘরে এসো বাকর।

টিম, চলিরে বলে চলে গেল। আমিও মিভোজের ঘরে গেলাম। বিশেষ পরিস্থিতির জন্য এক প্রেস-বিজ্ঞপ্তি লেখার জন্য বললেন আমাকে, লিখলাম।

ওদেত সংক্রান্ত সব লিখলাম। ওদেতের জীবনহানি আশঙ্কার সম্পর্কেও লিখলাম।

এমন সময় রেনিক ঢুকলো।

বুঝলেন স্যর, মনে হচ্ছে আশার আলো দেখতে পাচ্ছি। কার্বি বলল, সেই লোকটা নাকি প্রায় ছ ফুট বলিষ্ঠ গড়নের। এও জানলাম সে লাকি-স্টাইক সিগারেটের ভক্ত, যে

গাড়িতে চড়ে এসেছিল সে, তার তেলের ট্যাঙ্ক ফুটো এবং সর্বোপরি ওজন তার একশো আশি পাউন্ড।

তুমি জানলে কিভাবে?

জুতোর ছাপ দেখে।

বাঃ চমৎকার। বাজিমাত হতে আর দেরি নেই। এবার দরজা ঠেলে রেগলার ঢুকলো।

এদিকে একটা দারুণ, কাণ্ড হয়ে গেছে স্যর? রীচ রোডের হাবার্ট ক্যারী একটু আগে তার গাড়ির অ্যাক্সিডেন্টের ব্যাপারে থানায় ডায়রী করতে এসেছিলেন।

কেন?

যে গাড়ির সঙ্গে তাঁর গাড়ির ধাক্কা লেগেছিল সেটা ছিল ওদেত ম্যালরুক্সের স্পোর্টস কার?

বলো কি?

আসল রহস্যটা তো ওখানেই। গর্বের হাসি হাসলো রেইগার।

গাড়ির ড্রাইভার কে চালক, না চালিকা?

চালক স্যর।

চেয়ার ছেড়ে উঠে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো।

তুমি তাকে এখুনি এখানে নিয়ে এসো।

সে ব্যবস্থাও করে এসেছি। জ্যামন্ডও এক্ষুনি এসে পড়বে।

এখন আর আমার থাকা সমীচীন নয়। ফিরলাম, জন, ডেসকে একরাশ কাজ...

কাজ! বসো, বসো, কাজ-টাজ নিয়ে পরে যাহোক ভাবা যাবে।

অগত্যা বসতেই হলো।

সামরিক বাহিনীর লোকেরা ইতিমধ্যে বাড়ি বাড়ি তল্লাশী শুরু করে দিয়েছে।

দরজায় টোকা পড়লো।

সস্ত্রীক হার্বার্ট ক্যারিকে নিয়ে ঢুকলো এক পুলিশ-অফিসার।

ঘরে পা দিয়েই শুরু হল মিসেস ক্যারির গজগজানি।

হ্যাঁ যে কথা বলছিলাম শুরু করলেন ভদ্রমহিলা।

মিভোজ বলে উঠলেন, গাড়ির চালকের চেহারার বর্ণনা দিতে পারবেন?

আজ্ঞে হ্যাঁ স্যর, হাবার্ট ক্যারি বললেন।

কি রকম দেখতে সে?

মানে, একে অন্ধকার তবে লম্বা বেশ, চেহারাও মজবুত।

মিসেস ক্যারি ঘাড় নাড়লেন, নানা। বড়জোর লম্বায় এঁনার মতো। বলে হাত তুলে মিভোজ– কে দেখালেন।

মিভোজ বললেন, মিসেস ক্যারি কথা আমরা আপনার স্বামীর সঙ্গেই বলছি।

মানে সীটে বসেছিল যতদূর আন্দাজ, বলে আমার দিকে তাকালেন, তাকিয়েই রইলেন।

কি, এর মতো? বার্কর তুমি একটু দাঁড়াও তো, লোকটা কি এরই মতো লম্বা?

হ্যাঁ, যতদূর মনে হচ্ছে, দেখতেও সে অনেকটা এনারই মতো।

বেশ এবার বলুন।

সে এক অদ্ভুত কাণ্ড স্যর। দোষটা স্যর আমারই।

মিসেস ক্যারি বলে উঠলেন, না দোষ তোমার নয়, আকস্মিক একটা ধাক্কা মেরে লম্বা নেব...তারপর পগার পার।

মিসেস ক্যারি দয়া করে এবার একটু চুপ করুন। গলার স্বর, বয়স আন্দাজ করতে পারেন?

বয়েস কমপক্ষে তিরিশ।

পোশাকটা?

অন্ধকারে যতদূর মনে পড়ছে তার পরনে ছিলো বাদামী রংয়ের ব্লেজার।

তার মাথায় টুপি ছিল?

না।

ফর্সা না কালো?

ঠিক বলতে পারব না।

তার গলার স্বর শুনলে তাকে চিনতে পারবেন?

না, চেনা সম্ভব নয়।

কটা নাগাদ হয়েছিল অ্যাক্সিডেন্ট?

দশটা দশ।

গাড়িটা কোন দিকে এগোলো?

এয়ারপোর্টের দিকে।

আচ্ছা রেনিক, এয়ারপোর্টে খোঁজখবর নেবার ব্যবস্থা হয়েছে?

না, আপনি যদি বলেন।

তদন্তের জন্য কোনো জায়গাই বাদ দিলে চলবে না।

ধন্যবাদ মিঃ ক্যারি, দরকার হলে ভবিষ্যতে এরকম সাহায্যের জন্য আসতে হতে পারে।

হ্যাঁ, হ্যাঁ।

এবার চলল, আদিখ্যেতা দেখাতে হবেনা, বলে গজগজ করতে করতে স্ত্রী দরজার দিকে এগোলেন।

যেতে গিয়ে ক্যারি আড়চোখে আমার দিকে তাকালেন। যদি কিছু মনে না করেন মিঃ মিভেজ...উনি কে? বলে আমাকে দেখালেন।

হ্যারি বাকর, প্রেস-অফিসার। কিন্তু কেন?

এমনিই, বলে বড় বড় পা ফেলে দরজার দিকে এগোলেন।

তাহলে লোকটা লম্বায় ছ ফুট, ওজন একশো আশি পাউন্ড... আচ্ছা হ্যারী, তোমার দিকে তাকালো সে তোমার ওজন কত?

আমার?...একশো নব্বই। কিন্তু আমার ওজন জেনে তোমার লাভ কিসের?

লাভ, লাভ...ভাবছি তোমার মুখের অংশটুকু ঢেকে তোমারই একখানাছবিকাগজে ছেপে দিই– এরকম চেহারার কোনো লোককে যদি,শনিবার রাত নটার পর লোনবে অথবা পাইরেটস কেবিনের আশপাশে দেখে থাকেন, তিনি আমাদের দপ্তরে এসে যোগাযোগ করুন। স্যর, আপনি কি বলেন?

খুব ভাল আইডিয়া। তাহলে শুধু বাকি রইল এখন এয়ারপোর্ট। তুমি বরং রেগলারকে নিয়ে এক্ষুনি এয়ারপোর্ট চলে যাও। আর বাকর, যেমন যেমন শুনলে চটপট এক রিপোর্ট তৈরি করে ফেলো।

৩. নিজের ঘরে ফিরে

নিজের ঘরে ফিরে চেয়ারে শরীর এলিয়ে চোখ বুজলাম। হুঁ, জালে এবার মোক্ষম টান পড়েছে। ছবিছাপাহলে, কে কোথায় আমাকে দেখেছেভগবান জানেন।এখনআসল যে কাজটা গাড়ির ট্রাকে রাখা বড়মানুষের মেয়েটি তো চব্বিশ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই গন্ধ ছড়াতে শুরু করবেন। আজ রাতের মধ্যেই হেস্তনেস্ত করা দরকার। নিনা জেগে থাকলে আমার পক্ষে কিছু করা সম্ভব না।

হঠাৎ বেজে উঠলো ফোন। নিউজ ডেইলির বার্তা সম্পাদকের ফোন। সব জানালাম।

জেল থেকে বেরোবার পর নিনার তাড়া খেয়ে এরকমই একটা ব্লেজার আমাকে কিনতে হয়েছিল। রেনিকের স্বরে চমকে উঠলাম। দেখি রেনিকের হাতে হুবহু সেই ব্লেজার।

কি হে, স্ত্রীর ধ্যানে বসলে নাকি।নাও চটপট এটা পরে ফেলল। ছবি তোলার লোকেদের বসিয়ে এসেছি।

অতএব উঠতে হল। ছবি দেখে মিভোজ ভারি খুশী। রেনিক মিতোজকে জানাল যে, সেদিন প্লেনে যারা ছিল তাদের মধ্যে এয়ারহোস্টেস ছাড়া সেই মেয়েটি একাকিনী।

মেয়েটার নাম কি?

অ্যান হারকুট। মিস ম্যানরুক্সের ছবি এয়ারহোস্টেসকে দেখালামনা এরকম চেহারার মেয়ে সে রাতে প্লেনে ছিল না।

চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ালাম– জন, আমি তাহলে...

হ্যাঁ, স্বচ্ছন্দে।

নিজের কামরায় গিয়ে নিনাকে ফোন করলাম।

হ্যারি।

হ্যাঁ, আজও ফিরতে রাত হবে আমার।

সামরিক বাহিনী উত্তরপ্রান্ত থেকে তল্লাশী চালাতে চালাতে ক্রমশঃ দক্ষিণ-মুখো এগোচ্ছে। হিসেবমতো এতক্ষণে তারা আমার বাড়ির দিকে...।

হ্যামন্ডের সাকরেদ টেড ব্রাউনকে একটা গাড়ি দিতে বললাম।

বেশ তো, গাড়ি নেবেন, এ আর বেশি কি কথা।

ঠিক আছে, চটপট তেল-টেল ভরে দাও। নটার মধ্যে আমাকে আবার...।

এমন সময় স্বয়ং হ্যামন্ড এসে হাজির।

হ্যামন্ড বাকিতে গাড়ি দিতে চাইলেন না। উনি চাইছে ত্রিশ ডলার, আর আমার কাছে আছে মাত্র সোয়া দু ডলার।

না, আর দাঁড়ালাম না। এগোলাম বাড়ির দিকে।

সামনের মোড়টা পেরোলেই বাড়ি। মোড়ের কাছাকাছি পৌঁছে থমকে দাঁড়ালাম। সার্জেন্ট...।

তার মানে আমার বাড়িটাও খানা তল্লাসী করেছে। দেখি গ্যারেজের দু-পাল্লার দরজাটা খোলা। একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে সামরিক বাহিনীর পোশাক পরা দুই যুবক। নিনা দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে তাদের কি যেন বোঝাচ্ছে।

আমি কাছে যেতেই নিনা বলে উঠল, ঐ তো-খোদ বাড়ির মালিক হাজির। যা দরকার– ওর কাছেই বলুন।

কি ব্যাপার নিনা? এতো রাতে এঁরা দুজন, ব্যাপার কি?

গাড়ির ট্রাক খুলে না দেখানো অবধি

কেন?

আগে তুমি ট্রাঙ্কের চাবিটা দাও এদের।

কিন্তু নিনা চাবিটা আসার সময় দোকানে দিয়ে এলাম। নতুন একজোড়া চাবি বানিয়ে নেবার জন্য...।

কাল আটটার পর নতুন পুরনো সব চাবিই এসে যাচ্ছে। তখন আসুন।

ঠিক আছে, বলে হ্যাঙ্ক চলো জো, এখনও অর্ধেক রাস্তা।

দাঁড়াও, দাঁড়াও-কালকের জন্য কিছু ফেলে রাখা যাবে না। ট্রাঙ্ক ভেঙেই বরং...।

তার মানে! ট্রাঙ্ক ভাঙতে চাইলে আমি যে ট্রাঙ্ক ভাঙতে দেবো এ কথাটা আপনার মাথায় ঢোকালো কে?

সঙ্গে আমার ওয়ারেন্ট আছে।

আমি পুলিশ হেড কোয়ার্টার্সে চাকরি করি।

ট্রাক আমাকে ভাঙতেই হচ্ছে।

খবরদার। নিনা সামনের মোড়ে একজন সার্জেন্টকে দেখে এলাম, তাকে একবার...।

তোমাকে ফাঁসিকাঠে ঝোলাবেন।

মিনিট দুই কাটতে না কাটতে ফিরে এলো নিনা সঙ্গে আগের দেখা সেই সার্জেন্ট।

কি ব্যাপার, এতো গোলমাল কিসের?

ট্রাঙ্কটা আমি খুলতে চাই, ইনি বলছেন চাবি এর কাছে নেই। তালা ভেঙে দেবার কথা বলছি, তাতেও ইনি রাজী নন।

চাবি, আপনার কাছে নেই কেন?

নতুন একপ্রস্থ চাবি বানাতে আমার সব চাবিই আজ দিয়ে আসতে হল দোকানে।

কোন দোকান?

সেক্রেটারীকে দিয়েছিলাম, তিনি কোথায় দিয়েছেন, জানি না। হেড কোয়ার্টার্সে চাকরি করি, সারা দিন যা ঝামেলা। বারবার বলছি এঁরা যেন কাল এসে যখন হোক যা দেখার দেখে যায়–ঐ এক গো–তালা ভেঙে এখনই এই মুহূর্তে ট্রাঙ্ক দেখবেই।

এটা আপনাদের বাড়াবাড়ি হচ্ছে।হেড কোয়ার্টার্সের লোক...কথায়ও তো একটা দাম দিতে হয়।

ট্রাঙ্ক আমি ভাঙবোই।

ভাঙার আগে ক্ষতিপূরণের কথাবার্তা যে মনে রাখতে হবে।

আমি বললাম, অত তর্ক-বিতর্কে লাভ নেই। বরং এক কাজ করা যাক, রেনিককে একবার ফোন করি। সে যদি মত দেয়, তবেই তালা ভাঙবেন।

ঠিক, আপনি তাই করুন। সার্জেন্ট বলে উঠলো।

ধ্যাৎ, পুলিশের কাজ কারবারই এমন। চলল হ্যাঙ্ক, এখানে আর না। রিপোর্ট দেবার সময় চীফ অফিসারকে আমি সব ব্যাপারটা বলব।

ধন্যবাদ সার্জেন্ট, অসংখ্য ধন্যবাদ। অভিবাদন জানিয়ে বিদায় নিলো সে।

নিনা কপাল চাপড়ালো, ও কি কাণ্ড! সামান্য একটা চাবির জন্য। দুদিন সবুর করলেও তো...

বাদ দাও, আর ভালো লাগছে না। দাও চাবিটা দাও, গ্যারেজের তালা বন্ধ করে রাখি।

চাবি দিলো নিনা। দাও, এবার একটু হুইস্কি দাও।

ধরো সিগারেট।

দাও।

দেশলাইটা কোথায় যে রাখলাম।

আমার কোটের পকেটে লাইটার আছে।

নিনা কোটের পকেটে হাত ঢোকালো। হ্যারি...! নিনা চীৎকার করে উঠলো। চকিতে তার দিকে তাকালাম। দু-আঙুলের ফাঁকে ধরা আমার চাবির রিং। সব চাবিই ওতে আছে।

গলা আমার শুকিয়ে কাঠ। হাত থেকে গ্লাসটা পড়ে গেল আমার।

নিনার মর্মভেদী দৃষ্টির সামনে পড়ে আমি আরেকবার মৃত্যুকে যেন প্রত্যক্ষ করলাম।

ঘড়িতে তখন ঢং ঢং করে দশটা বাজলো। নীরবতা ভাঙলো নিনা। বিড়বিড় করে বলল, মেয়েটা তাহলে গাড়ির ট্রাঙ্কেই আছে।

আমি মাথা নীচু করলাম।

বলো হ্যারি, কি করেছ তুমি হাঁটু গেড়ে বসে আমাকে ঝাঁকালো।

বিশ্বাস করো–আমি কিছু করিনি।

তুমি তাকে খুন করেছ?

না নিনা, না তোমার গা ছুঁয়ে বলছি আমি কিছুই করিনি।

তাহলে গাড়ির ট্রাঙ্কে সে এল কি ভাবে।

সে এক বিরাট ইতিহাস নিনা, তুমি কি সব কথা বিশ্বাস করবে?

চোখের কোণে জল টলমল করে উঠলো। আচ্ছা তোমাকে ছাড়া আমি আর কাকে বিশ্বাস করবো হ্যারি।

এতোদিনের জমাটবাধা কান্না আর বাধা মানলোনা। নিনাকে শক্ত আলিঙ্গনে আঁকড়ে ধরলাম। বললাম, রিয়ার সাথে প্রথম পরিচয়ের বিবরণ থেকে সব।

এমনকি ওদেতের সাথে দুরাত কাটানো।

নিনা বলল এত কাণ্ড। আমায় আগে বলোনি কেন?

বলিনি, আমার এই অভিশাপের কথা তোমাকে বলতে গিয়েও পারিনি।

তুমি...তোমার সব কিছুর অংশীদার হতে চাই আমি।

পরম নির্ভয়ে তাকে বুকে টেনে নিলাম। অনেক দিন পর আবার সহজভাবে শ্বাস নিতে পারলাম।

বাধা দিল নিনা, দেরি করা আর ঠিক নয়, চলো।

হ্যাঁ অনেক বিপদ। মৃতদেহ হয়তো পচতে শুরু করেছে। একবার যদি কয়লাখনিতে নিয়ে যেতে পারতাম।

হ্যাঁ, একখানা গাড়ি এক্ষুনি দরকার, কিন্তু ভাড়ার টাকা।

ভাড়ার টাকা তো ট্রাঙ্কেই আছে। ম্যানরুক্সের টাকার বাক্স-ওদেতের মৃতদেহের সঙ্গেই আছে।

বেশ তাহলে তুমি এক কাজ করো। গাড়ি নিয়ে এসো।

উঠলাম। নিনাকে বললাম তুমি চারিদিকে নজর রাখো। আমি অ্যাটাচি নিয়ে আসছি। গ্যারেজের দরজায় তালা খুলে হাট করে দিলাম। পচা গন্ধ বেরিয়েছে। লাশ পচতে শুরু

করেছে। তালাটা খুলে অ্যাটাচিটা বার করলাম। শরীর অসাড়, বৈঠকখানার সোফায় শরীর এলিয়ে চোখ বুজলাম।

হুইস্কির গ্লাস এগিয়ে ধরলো নিনা। দুপ্রান্তে দুটি ট্রি তালা। চাপ পড়তেই তালাটা ফাঁক হল।

কিন্তু না, টাকা নেই, টাকার বদলে একরাশ ভাজ করা খবরের কাগজ। দু-হাতে মুখ ঢেকে আমি চোখ বুজলাম।

গাড়ি ভাড়া করার মত তিরিশ ডলারও আমার নেই।

টাকা, টাকা কোথায়?

নেই।

তা হলে এসব ম্যানরুক্সেরই কারসাজি।

না, কারসাজি করার লোক তিনি নন।

ম্যানরুক্স আসলে একজোড়া হুবহু অ্যাটাচি কিনেছিলেন। চালাকি করে কেউ হয়তো বদল করেছে।

চালাকিটা করবে কে?

কেন, রিয়া, কু-মতলবের শিরোমণি। বিশ্বাসের নামে সে আমাকে ঠকিয়েছে।

থাক, ওসব কথা, আগে একটা গাড়ি যোগাড় করতে হবে। বাঁ দিকের রাস্তায় অজস্র গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকে...ওর একখানা যদি নিই?

আমরা গাড়ি চুরি করবো?

না, চুরি নয়, ধার। কিছুক্ষণের জন্য।

রাস্তায় বেড়িয়ে এলাম। অসংখ্য গাড়ি। পুরোনো মডেলের বড়সড় গাড়ি। দরজার হাতলে চাপ দিলো নিনা। খট করে একটা শব্দ। দরজা খুললো। যাক বাঁচা গেলো। চাবিটা ড্যাশবোর্ডেই আছে।

তবে কি এখনই?

না এখন নয়। রাত বাড়ুক, ততক্ষণ আমরা সমুদ্রের পাড়ে একটু বসি।

পাশাপাশি আমরা বসলাম।

ফিসফিস করলো নিনা, কিন্তু মেয়েটাকে খুন করলো কে?

ঠিক, একথাটা আমিও সমানে ভেবে চলেছি।

রিয়া?

হতে পারে।

দেখো, আমার কেবল মনে হচ্ছে তোমার এই রিয়ার একজন প্রেমিক আছে।

হতে পারে।

আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে অনেক প্রশ্নের ঝড় উঠলো। উঠলাম আমরা। চারদিকে সতর্কদৃষ্টি ঘুরিয়ে দরজা খুললো নিনা। গাড়িতে উঠে বসলো। আমিও উঠলাম। বাংলোর দিকে যেতে শুরু করল নিনা।

গ্যারেজে পৌঁছে তালাটা খুলে মৃতদেহ ও অ্যাটাচিটা ঐ গাড়ির মধ্যে রেখে দিলাম। তারপর সমুদ্রের কাছাকাছি নির্জন এক জায়গায় এসে গাড়ি দাঁড় করালো নিনা। আমি আর নিনা নেমে বাড়ির দিকে ছুটতে শুরু করলাম।

বাড়ি ফিরে নিনা জ্ঞান হারালো। জ্ঞান ফিরলো একঘণ্টা পর। আমি এগোলাম গ্যারেজের দিকে।

হ্যাঁ, কাজ এখনো বাকি। ওদেতের টুকিটাকি জিনিস সহ সটকেশটার সদগতি করা দরকার। রান্নাঘরে গ্যাসচুন্নী জ্বেলে সুটকেস পুড়িয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

সকাল নটার সময় অফিসে গেলাম। মাথা ধরে আছে। রাজ্যের ঘুম আসছে চোখে। প্রায় মিনিট পনেরো পর হঠাৎ ঝনঝন করে বেজে উঠল ফোন।

হ্যালো। হ্যারি বলছি।

হ্যারি, ম্যানরুক্সের মেয়ের সন্ধান পাওয়া গেছে।

বলো কি!

গুণ্ডারা তার মৃতদেহ একখানা চুরি-করা গাড়ির ট্রাঙ্কে পুরে সমুদ্রের ধারে ফেলে রেখে গেছে।

তার মানে...খুন।

তুমি এখুনি থানায় চলে এসো।

এই সেই গাড়ি, ছবি তোলা থেকে ওরনানারকম পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে। ট্রাকের তালা খোলা। অ্যাটাচিটা পড়ে আছে একপাশে।

ভারি মজার ব্যাপার, টাকার বদলে অ্যাটাচি বোঝাই এক পাঁজা পুরনো খবরের কাগজ।

বলল কি, অবাক কাণ্ড তো।

যাই হোক, তুমি বরং ম্যানরুক্সের বাড়িতে চলে যাও। ওঁকে সঙ্গে নিয়ে এসো। মৃতদেহ সনাক্ত করতে হবে।

আমি..মানে, উনি তো অসুস্থ।

যাও, উনি আসতে না পারেন ও'রিলেকে সঙ্গে করে নিয়ে এসো।

পুলিশ হেড কোয়ার্টার্স থেকে আসছি। মিঃ ম্যানরুক্স...

উনি খুবই অসুস্থ। ডাক্তারের বারণ...।

তাহলে মিসেস ম্যানরুক্সকেই ডাকুন।

আমিও তার সঙ্গে গেলাম ভেতরে। টানা হলঘর পেরিয়ে সেই পেছনের উঠোন। আরাম চেয়ারে বসে কাগজ পড়ছে রিয়া। ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে। আমাদের পায়ের শব্দে চোখ তুলল। আমার দিকে চোখে চোখ পড়তে সে যেন একটু অবাক হলো। চোয়াল শক্ত হলো তার।ইনি...একে তো ঠিক...

হ্যারি বার্কর। হেড কোয়ার্টার্স থেকে আসছি।

হাতের ইশারায় খানসামাকে চলে যেতে বলল রিয়া। কিছুক্ষণ দুজনেই নির্বাক। আমি হাসলাম, কি চিনতে পারছেন?

রিয়া সিগারেট ধরিয়ে বলল, কেন এসেছে বলুন।

এলাম....আসতেই হলো। মৃতদেহের হদিশ যে পুলিশ পেয়েছে, সেই খবরটুকু জানাতে এলাম।

ওদেত তাহলে মারা গেছে।

বাঃ অপূর্ব। সে যে মারা গেছে একথা আপনার চেয়ে ভালো আর কে জানে?

টাকার লোভে শেষে আপনি ওকে খুনই করলেন?

হাসলাম, আমাকে দোষারোপ করে কোন লাভ নেই মিসেস ম্যানরুক্স। আর কেউ না জানুক, আমি জানি আপনিই দায়ী। আপনাকে নিস্তার দিচ্ছি না।

এসব কি বলছেন।

স্বামী মারা যাবার পর পুরো সম্পত্তি হাতের মুঠোয় আনার এমন সুন্দর এক সুযোগ...

আশ্চর্য, সেদিন রাতে ঘুমের ওষুধ খেয়ে আমি তখন শয্যাশায়ী। আপনি সে রাতে কোথায় ছিলেন?

আমি কোথায় ছিলাম না ছিলাম তাতে আপনার লাভ হবে না। এব্যাপারে আমাকে জড়াতে চাইলে আপনিও নিস্তার পাবেন না।

আপনি অনর্থক ভয় দেখাচ্ছেন মিঃ।মনে রাখবেন, জেল ফেরত একজন কয়েদীর মুখেরকথায় চেয়ে পুলিশ কোটিপতির স্ত্রীর কথাতেই অনেক বেশি মর্যাদা দেবে।

আমাকে যতটা বোকা ভেবেছিলেন, আসলে আমি তা নই। আপনার মতলব বুঝতে আমার এতোটুকু অসুবিধে হয়নি। তাই শুরু থেকেই আমি সতর্ক ছিলাম। আমাদের সব কতাবার্তা আমি টেপ করে রেখেছি।

তার মানে...একা পেয়ে আপনি আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন?

সময় এলে বুঝতে পারবেন। কাঁচের দরজা ঠেলে এক বলিষ্ঠ চেহারার যুবক এল। বয়স আমারই মত।

ও'রিলে...আশ্চর্য। আমার ধারণা ছিল ও'রিলে বয়সে প্রৌঢ়, কিন্তু আজ দেখছি, সে যুবক।

গাড়ি তৈরি ম্যাডাম।

থাক, আজ শরীরটা ভালো নয়, যাব না।

আমি উঠে দাঁড়ালাম।

বলছিলাম, ওদেত-কে যে অবস্থায় পেয়েছি, তার পরনে ছিল নীলের ওপর সাদা ডোরাকাটা স্কার্ট। এই পোশাকটা এলো কোত্থেকে?

স্কার্টটা আমিই কিনে দিয়েছিলাম।সস্তা দামের জামা, মান-টান করতে লাগত। গাড়িতেই রেখে দিতে ওদেত। বলে দ্রুত সে চলে গেল।

আপনি নিশ্চয়ই মিঃ বার্কর?

চমকে চোখ ফেরালাম। আমিই ও'রিলে।

রেনিক বলছিল মৃতদেহ সনাক্ত করতে, আমি যেন আপনাকেই সঙ্গে নিয়ে যাই।

মৃতদেহ, তার মানে মিস ম্যানরুক্স তাহলে খুনই হল।

হ্যাঁ।

সেই একবাক্স টাকা, তার কোনো হদিশ পাননি বুঝি?

না।

টাকার হদিশ বের করুন, এই ষড়যন্ত্রের নায়ক কে তারও হদিশ পাবেন।

হাতে হাত ঘষলো সে,ইস, অমন ফুলের মত মেয়েটা, কোন শয়তান যে তাকে গলা টিপে মারলো। দাঁড়ান মিঃ ম্যানরুক্সকে খবরটা দিয়ে আসি। বলে সে পা বাড়ালো।

আশ্চর্য আমি তোকাউকেই বলিনি ওদেত কিভাবে মারা গেছে। কোনো কাগজেও ছাপা হয়নি। তাহলে ও'রিলে কিভাবে জানতে পারলো যে তাকে গলা টিপে মারা হয়েছে।

হ্যাঁ ঠিক ভেবেছি। এই ষড়যন্ত্রে রিয়ার দোসর ঐ ও'রিলে।

পাঁচ মিনিট পর ও'রিলে এল।

চলুন যাওয়া যাক।

ম্যানরুক্সকে বললেন?

বলেছি।

শুনে খুব ভেঙে পড়েছেন, না?

স্বাভাবিক।

অথচ দেখুন, মিসেস ম্যানরুক্স কিন্তু কত সহজ ভাবেই না নিলেন। হয়তো সৎ মেয়ে বলে পছন্দ-টছন্দ তেমন একটা...।

মাথা নাড়লো ও'রিলে–দুজনের একেবারে গলায় গলায় ভাব ছিল। মিসেস ম্যানরুক্সও কম দুঃখ পাননি। তবু ঐ এক ধরণ। ভেতরে ভেতরে গুমরান।

আমি বললাম, রেনি বলছিলো ওদেত মারা যাওয়ায় লাভটা একদিক থেকে মিসেস ম্যানরুক্সের।...অ্যাটাচির হদিশ পাওয়া গেছে।

কোন অ্যাটাচি?

ম্যানরুক্সের লুটের টাকার।

কোথায় পেলেন?

গাড়ির ট্রাঙ্কে।

পুরো টাকাটাই ছিল নাকি?

না, একরাশ পুরনো খবরের কাগজ।

সেকি! অতটাকা কি হল?

কি জানি...

মৃতদেহ সনাক্ত করে চলে গেলো ও'রিলে। আমি, রেনিক আর বান্টি আমরা তিনজনই জীপে করে হেড কোয়ার্টার্সের দিকে গেলাম।

রেনিক বলল, পোশাক পাল্টালো কেন সে? আর ঐ খবরের কাগজে ঠাসা অ্যাটাচি—

আগামীকাল দুপুরের আগেই আমার রিপোর্ট চাই।

দরজা খুলে উঁকি দিলে এক সার্জেন্ট, স্যর এক ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্যে অনেকক্ষণ থেকে বসে আছেন। নাম ক্রাইস কেলার।

পাঠিয়ে দাও,বলল রেনি। কিছুক্ষণ পর এক লম্বা চেহারার যুবক ঘরে ঢুকলো।

পকেট থেকে ভাঁজ করা একখানা খবরের কাগজ বের করে টেবিলে মেলে বলল ছবির এই লোকটিকে আমি দেখেছি লেফটেন্যান্ট।

কোথায়?

এয়ারপোর্টে।

বুকটা হঠাৎ ধক করে উঠলো।

কবে?

শনিবার রাত এগারোটায়। হঠাৎ দেখি এই লোকটা ব্লেজার পরে আসছিল।

তার মানে?

আসলে ব্লেজারের শখ আমার বহুদিনের কিনবো কিনবো করে আর কেনা হয়ে ওঠেনি। সেই জন্য কারোর গায়ে দেখলেই চোখ যায়।

স্বাভাবিক! তা তাকে দেখলে আপনি চিনবেন?

না।

একলা ছিল সে?

না, সঙ্গে একটি মেয়েও ছিল।

মেয়ে! দেখেছেন তাকে। কি পোশাক ছিল?

হ্যাঁ, পরনে ছিল নীলের ওপর সাদা ডোরাকাটা স্কার্ট, রোদ চশমা চোখে দেখতে মন্দ না। মাথায় লাল চুল।

রিসিভার তুললল রেনিক টেইলর? শোনো মেয়েটির পরনের পোশাকটা এখুনি একবার হেড কোয়ার্টার্সে পাঠিয়ে দাও।

কেলার অবাক আপনারা কার খবরটা জানতে চান বলুন তো? লোকটার না মেয়েটার?

কি করছিল তারা?

দুজনে এল লবিতে। একবারও তারা কথা বলেনি।

দরজা ঠেলে ঢুকলো এক সার্জেন্ট। হাতে ওদেতের নীল-পোশাকটা।

এই পোশাকটাই পরনে ছিল কি?

হ্যাঁ, এই জামাই পরা ছিল।

রেনিক হাত বাড়িয়ে দিল– ধন্যবাদ, মিঃ কেলার। ঠিকানাটা দয়া করে দিয়ে যান। আবার দরকার হতে পারে।

চলি তাহলে।

বান্টিকে ফোন করল রেনিক এখুনি চলে এসো। দেরী কোরো না।

আমার দিকে তাকিয়ে রেনিক বলল, হ্যারি, আগাগোড়া ব্যাপারটার মধ্যে কোথায় যেন গলদ আছে–ভয় দেখিয়ে টাকা আদায়ের মত এটা ব্যাপার না।

গলাটা আমার কেঁপে উঠলো। কেন, নয় কেন?

কেন নয়, এটাই যদি জানতে পারতাম...।

বান্টি ঢুকলো ঘরে। কি ব্যাপার এত জরুরী তলব?

কেলারের কথা আগাগোড়া বলল রেনিক বান্টিকে।

আশ্চর্য, এয়ারহোস্টেসের বর্ণনার সাথে কেলারের বর্ণনার দেখছি বেশ মিল আছে। প্লেনের মেয়েটির নাম অ্যান হারকুট।

আমার মন বলছে আগাগোড়া ব্যাপারটা মিথ্যে।

আশ্চর্য ব্যাপার, ওদেতের সাথে উইলিয়ামের দেখা মাসদুয়েক হল বন্ধ। আর তার ফোন পেয়েই সে পাইরেসি কেবিনে ছুটলো? সেই যে গেল, সেই যাওয়াই শেষ যাওয়া।

এরপর সঙ্গে এল বাদামী রঙের ব্লেজার, বলিষ্ঠ লম্বা-চওড়া গড়নের এক যুবক। গাড়ি পেছোতে গিয়ে লাগল ধাক্কা ক্যারির গাড়ির সাথে। তারপর দেখা গেল এয়ারপোর্টে। কেলারের বর্ণনা অনুযায়ী সে অ্যান হারকুট। কিন্তু আমার অনুমান সে ওদেত ম্যানরুক্স। সঙ্গী যুবকের কথামতো সে চটপট নিজেকে পাল্টেছে।

তারপর অ্যাটাচির ব্যাপারটা...।

কাল সকালেই সব রিপোর্ট চাই।

রেনিক আমাকে বলল-আর হ্যারি শহরের সব কাগজে মেয়েটির জামার সব ছবি ছাপাওঁ। দেখি কাজ এগোয় কিনা।

না। শেষ চেষ্টা আমার করতেই হবে। ও'রিলের অপরাধ প্রমাণের শেষ চেষ্টা, দেখা যাক। মুখ বুজে চুপচাপ কাজ করতে হল নব্বই মিনিট। খিদেয় পেট চো চো করছে। উঠব-তখনি বেজে উঠলো ফোন।

বিরক্তিতে রিসিভার তুললাম- হ্যালো।

হ্যারি, নিনার উদ্বেগ পূর্ণ স্বর ভেসে এলো।

তুমি এখুনি একবার বাড়িতে চলে এসো, ভীষণ দরকার।

দরকার, কেন হঠাৎ...।

নিনা ফোন নামিয়ে রেখেছে। রেনিকের কামরায় ঢুকলাম।..কি ব্যাপার?মুখ-চোখ এরকম?

আর বোলো না, নিনার ফোন পেলাম, বাড়ি যেতে হবে এখুনি, শরীর খারাপ।

যাও, চট করে ঘুরে এসো। অফিসের গাড়িগুলো...।

কথা শোনার ধৈর্য আমার নেই। বাড়ি পৌঁছলাম। না, নিনা এ-ঘরে নেই।

নিনা, কোথায় গেলে তুমি?

এই যে এখানে।

আমি ঢাকা বারান্দায় উঁকি দিলাম। দরজার দিকে মুখ করে নিনার উল্টো দিকের একখানি সোফায় বসে ও'রিলে। আর ডান হাতে এক ছোট্ট রিভলবার।

দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? আসুন।

আমি দাঁতে দাঁত চেপে বললাম–এই মুহূর্তে আপনি আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান।

রিভলবার শূন্যে ছুঁড়ে লুফে নিয়ে বলল ও'রিলে, আমি অতিথি–আমাকে তাড়ানো কি ঠিক হবে?

কি চান আপনি?

টেপ।

কিসের টেপ?

এই দেখো–সকালে রিয়াকে বলে এলেন–এর মধ্যে সব ভুলে গেলেন।

না ভুলিনি। এককালের ভালমানুষ।

পুলিশ অফিসার ও রিলে যে আজ কোটিপতির বৌয়ের পা-চাটা কুকুর...।

বাঃ চমৎকার, এত কিছু জেনে গেছেন আমার সম্বন্ধে, এবার চটপট টেপগুলো দিয়ে দিন।

না, টেপ আপনি পাবেন না।

মিঃ বার্কর অবাধ্য হবেন না। একটা গুলিতেই সব শেষ হয়ে যাবে, এত অব্যর্থ টিপ আমার।

আমি স্থির, নির্বাক।

ধরুন গুলিটা এক মুহূর্তে আপনার প্রিয়তমা স্ত্রীর ফুসফুস ঝাঁঝরা করে দিতে পারে। বা এই শিশির নাইট্রিক অ্যাসিডটা যদি আপনার স্ত্রীর মুখে কেউ ঢেলে দেয়...ভাবতে আমারই অবাক লাগছে মিঃ বার্কর।

আমি শিউরে উঠলাম। চলুন।

কোথায়?

ব্যাঙ্কে, লকারে টেপগুলো আছে।

সাবধান–ধোঁকা দেবার চেষ্টা করবেন না।

না, চলুন, বলে দরজার দিকে পা বাড়ালাম। নিনা ছুটে এসে পথ আগলালো।

আমি এক ঝটকায় সরিয়ে দিলাম নিনাকে।

টেপ হাতছাড়া করলে, প্রমাণ যে কিছুই থাকবে না। ঝোঁকের মাথায়...

আমি কর্ণপাত করলাম না। কালবিলম্ব না করে গাড়ি ছাড়লাম।

তাকিয়ে দেখলাম কিনা কাঁদছে।

দাঁত বের করে ও’রিলে হাসলো। তবে–এই না হলে মরদ।

আমি নিরুত্তর।

রিয়া বলল, টেপগুলো নাকি আপনার কাছেই রয়েছে। তা বলিহারি বটে আপনাকে! মনের এতো জোর আপনার। রেনিক বোধহয় আপনাকে সন্দেহ করে উঠতে পারেন নি তাই না?

হ্যাঁ, মাথা নাড়লাম আমি।

ঠিক পারবে, নিস্তার আপনি পাবেন না।

জানি।

তবে হ্যাঁ, বিপদে পড়ে শেষে আবার আমাকে বা রিয়াকে ঝামেলায় জড়াবেন না।

আমি ম্লান হাসলাম।

কি হল, হাসছেন যে!

হাসছি আপনার ভবিষ্যতের কথা ভেবে।

অর্থাৎ?

অর্থাৎ যা চিরকালের নিয়ম।

সে কিরকম মশাই।

সাদামাটা হিসেব। রিয়া ম্যানরুক্সকে বাঁচাবার জন্য আপনি আজ উঠে পড়ে লেগেছে। অনেক আশা আপনার। এই রিয়াই আপনাকে কুকুরের মতো লাথি মেরে তাড়িয়ে দিতে কসুর করবেনা। দুর্ভোগ আপনাকেও ভুগতে হবে।

সহসা অট্টহাসিতে ও রিলে ফেটে পড়লো। বাঃ মিঃ বাকর, কায়দাটা দেখছি বেশ ভালই করেছেন। কথার বোলচালে রিয়া, আমার মধ্যে একটা গোলমাল বাধাবার চেষ্টা করে লাভ নেই। ও রিলেকে অতো কাঁচা ছেলে ভাববেন না। রিয়ার কাছ থেকে কথা আদায় না করে....

কি কথা আদায় করবেন?

ভবিষ্যতের কথা। বুড়োটা মরে যাবার একমাস পর সে আমাকে বিয়ে করবে–এমনকি পুরো সম্পত্তির হিসেবটা।

আমি হেসে বললাম, এ ভুল আপনার ওখানেই মিঃ ও রিলে। সাংবাদিক জীবনে এমন ঘটনা আমি আকছার ঘটতে দেখেছি।

আমার জায়গায় যদি আপনি হতেন—

কি আবার আগে দেখতাম তার কথাকতদুর সত্যি।মুখে সেযাবলে,কাজেও তাইকরে কিনা।

আপনি একটা আস্ত গাধা। রিয়াকে চোখের দেখাই দেখেছেন শুধু। মনটা তার দেখেননি। এক কথার মেয়ে সে। মুখে যা বলে কাজেও তাই।

পরবর্তী কাজ সংক্ষিপ্ত। ব্যাঙ্কে ঢুকলাম। লকার থেকে টেপের বান্ডিল বের করে তুলে দিলাম ও'রিলের হাতে।

চলি।

আসুন, আমার উপদেশটা খেয়াল করবেন।

থাক।

অফিসে ফিরতে ফিরতে শোয়া তিনটে। ঘরে ঢুকে দেখি রেনিকের একটা চিঠি। তার সাথে দেখা করার জন্য। তার মানে এক ঘণ্টার অনুপস্থিতিতে অনেক জল গড়িয়েছে।

তিনটে কুড়ি, রেনিকের কামরায় পা রাখলাম।

আমার পায়ের শব্দে চোখতুলল। বোসো। রিপোর্টের শেষফাইলটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিই।

রেনিকের গলার স্বর গম্ভীর। একঘণ্টার আগের দেখা রেনিকের সাথে এ রেনিকের কোনো মিল নেই। আমি প্রমাদ গুনলাম।

হ্যারি–ওদেত ম্যালরুক্সের সাথে তোমার কি কোনো রকম জানাশোনা ছিল?

এসব তুমি কি বলছো জন। আমার সে সুযোগ কোথায়?

ঠিক তবু তার সম্বন্ধে যদি কিছু।

কিন্তু হঠাৎ এ প্রশ্ন আসছে কেন জন?

এমনি, খুনের ব্যাপার। নিজের বৌকে অবধি সন্দেহের চোখে দেখতে হয়। বলে সে হাসলো।

মনের অস্বস্তি চাপা দিতে আমিও তার সঙ্গে গলা না মিলিয়ে পারলাম না।

হ্যাঁ, বলতে ভুলে গেছি মিসেস ম্যালব্রুক্সের এখন সোনায় সোহাগা। পুরো সম্পত্তির উত্তরাধিকারী এখন সে।

জানো হ্যারি, মেয়েটার সম্বন্ধে যা জানলাম, ভাল না। কত লোকের সঙ্গে যে তার ভালবাসা ছিল। এখুনি লসএঞ্জেলস থেকে আমার লোকেরা ফোন করেছিলো। অ্যান হারকুটের সন্ধান তারা পেয়েছে। ময়না তদন্তের রিপোর্ট একটু আগে পেলাম। আচমকা পেছন থেকে মাথায় আঘাত, তারপর গলা টিপে খুন।

জন, আমি রং ঘরেই গিয়ে বসি, একগাদা কাজ রয়ে গেছে টেবিলে।

ঠিক আছে, তুমি ঘরে যাও।

সামনের ঝুল-বারান্দায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দুজন গোয়েন্দা-অফিসার। চাপা গলায় কি যেন তারা ফিসফাস করছে। আমাকে দেখে মুখ ঘুরিয়ে নিল। দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকলাম আমি।

হুঁ, পাহারার ব্যবস্থাও দেখছি।

সিগারেটের পর সিগারেট পোড়ালাম। চারটে বেজে দশ। পর্দা সরিয়ে উঁকি দিল রেনিক, চলো হে, বড় সাহেব ডাকছেন।

দুজনে মিভোজের ঘরে এলাম।

মিভোজ বললেন এসব কি শুনছি রেনিক?

আগাগোড়া ব্যাপারটাই একটা সুন্দর ছকে-ফেলা গল্প। মেয়েটি এবং ব্লেজার-পরা সঙ্গী দুজনে মিলে গল্পটা সাজিয়েছে।

অ্যান হারকুটের হাতের ছাপের সঙ্গে মিস ম্যানরুক্সের হাতের ছাপ হুবহু মিলে গেছে।

কিন্তু মেয়েটি খুন হলো।-কেন?

কারণ একটা নয়–অজস্র।

কিন্তু...কে সেই দোষী? তার পরিচয়...।

পেয়েছি। যেটুকু পেয়েছি, তাকে গ্রেপ্তার করার পক্ষে যথেষ্টনয়। বালির ব্যাপারে ফোরেনসিক রিপোর্টটা পেলে।

ঝনঝন করে বেজে উঠল ফোন। রেনিক রিসিভার তুলল।–হ্যালো, হ্যাঁ, পেয়েছো? বলো কি? আমরা এখুনি যাচ্ছি। রিসিভার নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়ালো সে।

ইস্ট বীচে এখুনি একবার আমাকে যেতে হচ্ছে। চলো হ্যারি, যাওয়া যাক।

বিল হোস্পেনের মুখখানা মুহূর্তে ভেসে উঠল। আমাকে দেখে যদি সে সবার সামনে শুরু করে দেয় টাকার তাগাদা–আমার তো দফা রফা।

আমি....আমাকে নিয়ে কেন টানা হ্যাঁচড়া করছো ভাই। টেবিলের কাজ প্রচুর।

থাক..চল। রেনিক ধমক দিল। সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে দেখি, সেই গোয়েন্দা অফিসার দুজন চলেছে। গাড়ির পেছনে উঠে বসলাম আমরা, তারা দুজন বসল চালকের পাশে।

ইস্ট বীচে পৌঁছতে পৌঁছতে সন্ধ্যে ছটা। গাড়ি থামলো বিল হোল্ডেনের অফিসের সামনে। আমরা নামলাম।

আসুন মিঃ বার্কর, আসুন। খবরটবর কি বলুন! বিল হেসে বলল।

পরিচয় করিয়ে দিই,ইনি লেফটেন্যান্ট রেনিক, হেড কোয়ার্টার্স থেকে আসছেন একটা জরুরী তদন্তের ব্যাপারে।

প্রশ্ন! আমাকে? কোন গোলমাল?

না তেমন কিছু নয়। বছর কুড়ি বয়স, মাথার চুল লালচে, নীলের ওপর সাদা ডোরাকাটা স্কার্ট চোখে রোদ-চশমা–এরকম কোনো মেয়েকে কিআপনিগতকয়েকদিনের মধ্যে এখানে দেখেছেন?

দুঃখিত স্যর।

কিন্তু শব্বিার মাঝরাত নাগাদ এখানে সে এসেছিলো মিঃ হোল্ডেন। আচ্ছা আপনাকে কত রাত অবধি থাকতে হয় এখানে?

আটটা, ভালো কথা মিঃ বার্কর তত শনিবার সারা রাত এখানেই ছিলেন।

যে ভয় এতোদিন করছিলাম, বিল দিল হাটে হাঁড়ি ভেঙে।

শনিবার রাত্রে এখানে আমি ছিলাম না, ছিলাম শুক্রবার। তোমার হিসেবে বোধহয় ভুল হচ্ছে।

হতে পারে..সারাটা দিন যা ধকল আমাকে পোয়াতে হয়...।

কিন্তু মিঃ বার্কর যে শনিবার রাতে এখানে ছিলেন–এ কথাটা হঠাৎ আপনার মাথায় এলো কেন? তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন রেনি।

আমি বললাম একটা উপন্যাস লেখার ব্যাপারে একটা কেবিন কদিনের জন্য ভাড়া নিয়েছিলাম জন।

সেকি। কেবিন ভাড়া নিয়েছিলে–আমাকে তো একবারও বল নি।

ভেবেছিলাম, বইখানা তোমার নামেই উৎসর্গ করবো। আগে থেকে তাই কিছু বলিনি।

চোখ ফেরালো রেনিক, শনিবার রাতে সব কেবিনই তালাবন্ধ ছিল–তাই না মিঃ হোল্ডেন?

হ্যাঁ, তবে মিঃ বার্কেরের কেবিনের চাবিটা ওনার কাছেই রাখতেন।

আমার দিকে চোখ ফিরিয়ে রেনিক জিজ্ঞেস করলো তোমার কেবিনে নিশ্চয়ই তালা লাগানো ছিল।

হুঁ, সেরকমই তোত মনে হচ্ছে।

কোন কেবিনটা ভাড়া নিয়েছিলে তুমি?

বাঁ দিকের শেষ কেবিন।

কেবিনটা কি এখন খালি, না লোকজন আছে।

না খালি।

চমৎকার, দিন চাবিটা দিন, কেবিনটাও দেখে যাই।

ঘাড় ফিরিয়ে রেনিক জিজ্ঞেস করলো, মিঃ হোল্ডেন, ওদেত ম্যানরুক্সকে আপনি কি কখনো দেখেছেন?

না, চাক্ষুস কখনো তাকে দেখিনি।

কেবিনে ঢুকে রেনিক বলল-বাঃ ব্যবস্থা তো দেখছি একেবারে রাজকীয়। তা এরকম কেবিন ভাড়া করলে, আমাকে জানালে না?

অন্যমনস্কর মতো ঘাড় নাড়লল রেনিক, হুঁ, খুন হবার পক্ষে আদর্শ জায়গাই বটে!

খুন যে এখানে হয়েছে একথা তুমি ভাবছো কেন?

বেশ ভালো করে ভেবে বল, শনিবার রাত্রে চাবি তুমি সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলে, না রেখে গিয়েছিলে?

আর বল কেন। তাড়াহুড়োর মধ্যে চাবিটা সেদিন নিতে ভুল হয়ে গেছে।

কয়েক মুহূর্ত স্থির হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো রেনিক–আরে ব্যস, সাড়ে ছটা, তুমি এখনি বাড়ি যাও, নিনার শরীর খারাপ...।

আরে ধূর, তুমিও যেমন, শরীর খারাপের ব্যাপারটা আসলে একটা মস্ত ধোঁকা। আমাকে তখন ঐ কথা বলে বাড়ি দৌড় করালো। গিয়ে দেখি পুরনো এক বান্ধবী এসেছে, পরিচয়

করিয়ে দেবার জন্য। আসার সময় শুনে এলাম, তারা দুজন কোথায় বেরোবে। হয়তো গিয়ে দেখবো নিনা এখনো ফেরেই নি। বরঞ্চ তোমার সাথে থাকি। দরকার টরকার যদি হয়।

আরে না না, দরকার আবার কিসের? থাক, তুমি বাড়ি যাও। রেনিকের স্বরে দৃঢ়তা। আমি জানি আমি চলে যাওয়া মাত্র ফোরেনসিক দপ্তরের তাবৎ লোজন ঘরে শুরু করে দেবে তাদের পরীক্ষা নিরীক্ষা। ঘরের প্রতিটি ইঞ্চি তারা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখবে। আমার সম্বন্ধে যেটুকু অজানা তাদের, সেটুকুও আর জানতে বাকি থাকবে না।

তাহলে চলি জন। কাল আবার দেখা হবে।

হু। ঘরের চারপাশ দেখতে দেখতে অ্যামনস্কের মতো মাথা নাড়লো রেনিক।

বিলের অফিসে গেলাম।

তোমার টাকাটা কালকে সকাল দশটার মধ্যে দিয়ে যাব বলে আর দাঁড়ালাম না–চলি।

বাসস্টপে এসে দাঁড়িয়েছি একখানা জীপ এসে থামলো আমার পাশ ঘেঁষে। সেই গোয়েন্দা। দুজন। একি! বাসে কেন? আমরা তো ঐ দিকেই যাচ্ছি, আপনাকে বরং গাড়ির সামনে...।

থাক, বাসেই যাবো। বলে আগত বাসে উঠে পড়লাম। মাইলখানেক যাবার পর নিতান্ত কৌতূহলের বশে ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনে দেখলাম সেই জীপখানা বাসের পেছন পেছন আসছে।

বাড়ি ফিরে দেখি নিনা চেয়ারে বসে আছে। আমাকে দেখে আমার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লো। জানো ওরা আজ এসেছিল।

কারা?

পুলিশ। দুপুরে আমি বেরিয়েছিলাম বাজারে। সেই ফাঁকে বাড়িতে ঢুকে ওরা কি যেন সব খোঁজ করে গেছে। হয়তো মাইক্রোফোন ফিট করে গেছে।

ইশারায় চুপ করতে বললাম। শিকারী বিড়ালের মতো আমি দেখতে লাগলাম। ঘড়ির পেছনে সরু কালো তারটা হঠাৎই নজরে পড়লো। সবদিক দিয়েই পাকাপাকি ব্যবস্থা। রেডিওটা চালু করলাম জোরে। রেডিওর সরব আর্তনাদে গমগম করতে লাগলো ঘর।

কি দেখে তুমি বুঝলে বাড়িতে কেউ এসেছিল।

ঐ দেখো, আলমারীটা খোলা। সব অগোছাল।

দেরী না করে তিনলাফে গিয়ে পৌঁছলাম আলমারির কাছে, হাতল টেনে পাল্লা খুললাম। জামা, প্যান্ট-কোট-টাই সবই আছে। নেই কেবল ব্লেজারটা।

ভয়ের একটা শীতল অনুভূতি শিরা উপশিরা বেয়ে ছড়িয়ে পড়ল সারা দেহে। এগিয়ে এসে নিনা দাঁড়ালো আমার পাশ ঘেঁষে– হ্যারি–কি হল?

আমার ব্লেজার, ওরা নিয়ে গেছে।

নিয়ে গেছে!

হা–নিনার চোখ জলে ভরে গেল। নিনাকে বুকে টেনে নিলাম। নির্বাক স্থানুর মত দাঁড়ানো ছাড়া আমার কিছু করার নেই।

তুমি টেপগুলো কেন দিলে?

ও'রিলে সব পারে, ও একটা খুনে।

আচ্ছা জনকে ডেকে যদি সব বল।

তাতেও লাভ হবে না। অনেক দেরী হয়ে গেছে। তাছাড়া হাতে আমার প্রমাণই বা কোথায়?

আচ্ছা টাকাগুলোই বা গেলো কোথায়?

হ্যাঁ, টাকা?

ব্যাঙ্কে।

না, ব্যাঙ্ক নয়, বাড়িতেও নয়।

তবে?

বাইরে কোথাও যেমন ধরো, স্টেশান, এয়ারপোর্টের লেফট-লাগেজ?

দাঁড়াও, পুরো ব্যাপারটা লিখে সাজিয়ে নিই। বলে একটা রিপোর্ট লিখলাম।

নিনা দেখলে কাগজটা। এতে তোমার লাভ?

আমার লেখা সব জায়গায় পৌঁছবে। প্রচারের ব্যাপারে বিন্দুমাত্র প্রশ্ন কেউ তুলবে না।

তাতে তোমার কি?

ও'রিলের মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়া কথাগুলো। আমি দুটো ফোন করে আসি ডাক্তারখানা থেকে। বাড়ি থেকে করা যাবে না বলে বেরিয়ে দেখি পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে।

হ্যালো, ফ্রেডের পরিচিত স্বর।

ফ্রেড আমি হ্যারি বলছি, একটা জরুরী রিপোর্ট আছে। রাত এগারটায় যদি প্রচারের ব্যবস্থা, করো...।

আলবাৎ, রিপোর্টটা কি বলল। আমি লিখে নিই।

কাগজের লেখাটুকু পড়ে শোনালাম তাকে।

ঠিক আছে।

এবার ম্যালব্রুক্সের বাড়িতে ফোন করলাম। হ্যালো? খানসামা জিজ্ঞেস করল।

পুলিশ হেড কোয়ার্টার্স থেকে বলছি। মিঃ ও'রিলেকে একবার দিন।

ধরুন।

ফোন তুললো ও'রিলে। হ্যালো?

চিনতে পারছেন?

বলুন কি দরকার?

শেষরক্ষা বোধহয় আর হল না। রেনিক একটা শক্ত মতলব এঁটেছে।

কিসের মতলব?

কিসের আবার, আপনাদের সাবার। রাত এগারোটার টেলিভিশনের বিশেষ ঘোষণাটি মন দিয়ে শুনবেন। ছাড়ছি। বলে ফোন নামিয়ে রাখলাম। ব্যস কাজ আমার শেষ। বাইরে এলাম।

মিঃ বার্কর, আপনাকে এক্ষুনি আমাদের সঙ্গে হেড কোয়ার্টার্সে যেতে হবে।

চলুন অপেক্ষমান জীপের দিকে এগোলাম। দু-আঙুলের ফাঁকে জ্বলন্ত সিগারেট, মুখের রেখায় এক নীরব ঔদাসীন্য–আমাকে ঘরে ঢুকতে দেখে চোখ তুললল রেনিক– এসো। হাতের ইশারায় সার্জেন্টটিকে চলে যেতে বললো রেনি। সিগারেটের প্যাকেট বের করলো রেনিক, আমার দিকে এগিয়ে ধরলো–নাও, সিগারেট নাও।

হাত বাড়িয়ে নিলাম। স্থিরদৃষ্টিতে আমার ভাব-ভঙ্গি লক্ষ্য করতে লাগলো।

তুমি এসব কেন করতে গেলে হ্যারি?

বলছি। আগে বললা–আমাকে কি তোমরা গ্রেপ্তার করেছো?

না, করিনি। গ্রেপ্তার করার আগে একবার ব্যাপারটা নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা করে নিতে চাই।

বেশ, কি জানতে চাও বলো।

তুমি...কি ওদেত ম্যানরুক্সকে খুন করেছ?

না, সেকথা তুমি কি বিশ্বাস করবে?

হ্যারি, বিশ বছরের পুরনো বন্ধু আমরা। যা যা হয়েছে, এই ঘটনায় কিভাবে কখন তুমি জড়িয়ে পড়েছো?

টিম কাইলি র সাথে ঘটনার রাতে এয়ারপোর্টে দেখা হওয়া থেকে শুরু করে..আগাগোড়া ব্যাপারটা তোমার মুখ থেকেই শোনা যাক।

বললাম। রিয়ার সাথে প্রথম দেখা হওয়া থেকে এখন যে দুটো ফোন করলাম সব কথা।

রেনিক স্তম্ভিত।বলো কি। ভেতরে ভেতরে এতো সব কাণ্ড। কিন্তু ওদেত বা রিয়া ম্যালরুক্সের দোষ প্রমাণ করবে কি করে?

প্রমাণ সব আছে। টেপের বান্ডিল ও রিলের হাতে তুলে দিয়ে আমি এখন নিঃস্ব। তুমি যদি আমাকে একটু সাহায্য করো।

আমার সাহায্য চাইছো তুমি...আমি কতটুকু কি করতে পারি?

বিশেষ কিছু না। আমার সঙ্গে একবার যাবে ম্যালরুক্সের বাড়িতে। সঙ্গে দলবলও থাকবে। বাকীটা এগারোটা বাজলেই জানতে পারবে।

বেশ, চলো। জীপে ম্যালরুক্সের বাড়ি দশ মিনিটের পথ। ফটকের পাহারায় একজন অফিসারকে রেখে নিঃশব্দে আমরা চারজন নুড়ি বিছানো পথে এগোলাম। দেয়ালের পাশ ঘেঁষে অতি সন্তর্পণে আমি জানলার পথে উঁকি দিলাম। বাঁ দিকের সোফায় আধশোয়া ও'রিলে। হাতে ধরা হুইস্কির গ্লাস, ডানদিকের ডিভানে চিত হয়ে শুয়ে রিয়া। তার হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। এগারোটা বাজতে ঠিক পাঁচ মিনিট বাকি।

টেলিভিশনটা চালাও –রিয়া বলল। উঠলো ও'রিলে। পর্দায় ভেসে উঠল ফ্রেড হিক্সনের মুখ।–আমার লেখা রিপোর্টটা পুরো পড়ে শোনাল। আমি চললাম, বলে ও'রিলে উঠল।

কোথায়? রিয়া জিজ্ঞেস করল।

মাল সামলাতে। এয়ারপোর্ট গিয়ে এক্ষুনি অ্যাটাচি ছাড়িয়ে আনতে হবে।

না ওসব যাওয়া-টাওয়া বাদ দাও।

তার মানে? সব তুলে দেবো, পুলিশের হাতে?

এছাড়া কোনো উপায় নেই।

রিয়া, তুমিই অ্যাটাচিটা ছাড়িয়ে আনন।

না। আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

রিয়া চোয়াল শক্ত করলো, ও রিলে। কথার অবাধ্য হয়ো না।

পারবো না।

গেলে ভালোই করতে, টেপের বান্ডিলটা রয়েছে অ্যাটাচিতে।

তার মানে?

মানে যা তাই। বাকরের দেওয়া টেপের বান্ডিল আমি অ্যাটাচিতেই রেখেছি।

সে কি, তুমি যে সেদিন বললে–টেপ তুমি পুড়িয়ে ফেলেছো?

না। মিথ্যে কথা বলেছিলাম।

কেন?

তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্যপ্রমাণ সবনষ্ট করে বসে থাকবো, আর টাকা পয়সা হাতিয়ে আমাকে দূর করে তাড়িয়ে দেবে, তা চলবে না। আগে আমাকে বিয়ে করবে, তারপর....

তুমি, একটা আস্ত নির্বোধ। পুলিশকে ফোন করে সব ঘটনা আমি বলবো। বলবো, বার্কর কোনো দোষ করেনি, ওদেতকে খুন করেছো তুমি। তোমারই প্ররোচনায় আমি এসব করেছি। আমাকে লেখা তোমার গাদাগাদা প্রেমপত্র তাদের নাকের সামনে ছুঁড়ে দেব।

আমাকে তুমি ভয় দেখাচ্ছো?

তোমার মতো জানোয়ারকে

কথা শেষ হলো না তার। ও'রিলের হাতে কালো একটা ছোট্ট রিভলবার।

বরং বলি কি, ভয় দেখানো, পুলিশ ডাকা, এয়ারপোর্টে গিয়ে অ্যাটাচি নিয়ে আসা–এসব থাক। এসবের চেয়ে সহজ যে কাজটা–যেমন ধরো, তোমার কপাল তাক করে মাত্র একটিবার ট্রিগার টেপাব্যস, ফুরিয়ে গেল ঝাট।

তুমি...আমাকে খুন করে নিস্তার পাবে না শয়তান। বার্কর সব জানে, সব।

রাখো তোমার বার্কর। আর দেরি কোরো না। হাত তুলে দেওয়ালের কাছে গিয়ে দাঁড়াও।

আমাকে এক ধাক্কায় সরিয়ে জানলাটপকে ঘরে ঢুকলো রেনিক। হাতে তার ৩৮ বোরের পুলিশ স্পেশ্যাল। ও'রিলের পিঠে রিভলবার তাক করে সে হুঙ্কার দিলোখবরদার ও রিলেসাবধান।

ক্ষিপ্র হায়নার মতো ঘাড় ফিরিয়ে ট্রিগার টিপলো ও'রিলে। তার রিভলবারের শব্দকে ছাপিয়ে গর্জে উঠলো রেনিকের পুলিশ-স্পেশ্যাল। মুঠো আলগা হয়ে রিভলবার গড়িয়ে পড়লো মেঝেয়, ও'রিলের জ্ঞানহীন দেহ লুটিয়ে পড়লো রিয়ার পায়ের কাছে।

দুহাতে মুখ ঢেকে হঠাৎ আকুল কান্নায় ভেঙে পড়লো রিয়া...।

পুলিশ হাসপাতালে মারা গেল ও'রিলে। জবানবন্দি দিয়ে গেল, ওদেতকে খুন করার মতলবটা আসলে রিয়ার। আমাকে দাবার গুটি হিসেবে ব্যবহার করার মূলেও সে। রিয়ার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছিল, ও'রিলে। ভালবাসার প্রতিদান হিসেবে সে এসব করেছে।

আবার সেই হাজতবাস। তিনদিনের দিন দেখা করতে এল রেনিক।

একটা সুখবর শোনাতে এলাম। এই মামলায় রাজসাক্ষী হিসেবে তোমার নাম প্রস্তাব করেছেন বড়কর্তা। রাজী?

হ্যাঁ, আমি রাজী।

যাক, তোমার শাস্তি মকুব করার ব্যবস্থাও বড়কর্তা করেছেন। তবে তোমার এ-শহরে বোধহয় আর জায়গা হবে না।

ভালো কথা, নিনা কেমন আছে?

ভালো, বলল আজ থেকেই বাড়ি বিক্রির চেষ্টায় সে উঠে পড়েছে। শহরটার ওপর তার ঘেন্না ধরে গেছে।

আজই তোমাকে সাক্ষী দিতে হবে। নিনাও কোর্টে হাজির থাকবে।

চলো তাহলে।

রিয়ার হয়ে পাঁচ, পাঁচজন দুদে ব্যারিস্টার লড়লো। ধোপে কোনো যুক্তিই টিকলো না। টেপ বজিয়ে শোনানো হল আদালতে। রায় দিলেন বিচারক। পনেরো বছরের জেল হল রিয়ার। আর আমার পাঁচ বছরের নির্বাসন। নির্বাসন বলতে এ শহর ছেড়ে অন্য যেকোন জায়গায়। এই পাঁচ বছর এ শহরে আসতে পারবো না। না, আর না। শহরটার ওপর আমারও ঘেন্না ধরে গেছে। এখন শুধু নিনা,নতুন করে বাঁচা। আদালতের বিরাট হলঘর পেরিয়ে বাইরে এলাম। দরজার কাছে প্রতীক্ষা করছিলো নিনা। চোখ ভর্তি জল।

আমার দিকে তাকিয়ে হাসলো। তার হাসিতে প্রতিশ্রুতির দৃঢ় অঙ্গীকার। হাত ধরে তুলে চুমু খেলাম। নতুন জীবনের পথে এগিয়ে গেলাম।